প্রত্যেক সমাজেই সমস্যার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সমাধানের চেষ্টা যে হচ্ছে না তা নয় কিন্তু সব দিক ভেবে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে অগ্রসর না হওয়ার চেষ্টা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করছে না। সমাজের সব সমস্যাই মানসিক ব্যাপারসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। আর মনোবিদ্যাই মানসিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে। আধুনিক মনোবিদ্যা যে সামাজিক সমস্যা লাঘব করবার যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে সেই দিকে সমাজ-সেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল। এই পুস্তকে সেই প্রবন্ধগুলি সন্নি-বেশিত করা হয়েছে।

সং স্কৃ তি বৈ ঠ ক

অনিচ্ছাকৃত

মনোবিদ্যা বিষয়ে সহজ ভাষায় লেখা প্রবন্ধাবলী

ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

এম, এ ; পি, এইচ-ডি (লাইপজিগ্) ; এফ, এন, আই

সংস্কৃতি বৈঠক

বা লি গ ঞ্জ ঃ ক লি কা তা

আড়াই টাকা

প্রকাশক :
সংস্কৃতি বৈঠকের পক্ষে
শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী
১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা ২৯

প্রচ্ছদপট ও আলোকচিত্র : অসিতকুমার রায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : দি ফটোগ্রাফিক ষ্টোর্স
য়্যাণ্ড এজেন্সি লিঃ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট

পুস্তক মুদ্রণ : হরিপদ পাত্র, সত্যনারায়ণ প্রেস
১৬০, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বাঁধাই : ভারত প্রিন্টিং য়্যাণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১২১-সি বহুবাজার ষ্ট্রীট

ভূমিকা

মনোবিদ্যার তত্ত্বগুলি শুধু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধিই করে না, উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হলে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধানে তারা যথেষ্ট সহায়তা করে। কি করে সাহায্য করতে পারে এই প্রবন্ধগুলিতে তারই কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। সব রকম সমস্যার যে আলোচনা করা হয়নি তা বলাই বাহুল্য।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে শনিবারের চিঠি, সংহতি, প্রবাসী, কালান্তর, দ্বন্দ্ব, উজ্জ্বল ভারত এবং জ্ঞানবিজ্ঞান পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বন্ধুবান্ধব, বিশেষতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধে এগুলিকে একত্র সংকলন করে ভাষার কিছু কিছু পরিবর্তন করে এবার পুস্তকাকারে প্রকাশ করছি। এ রকম সংকলনে কিছু পুনরুক্তি দোষ থেকেই যায়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (technical terms) যথাসম্ভব কম ব্যবহার করেও প্রবন্ধগুলিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছি। আশা করি তাতে সকল শ্রেণীর পাঠকেরই বিষয়বস্তু বোঝবার পক্ষে সুবিধা হবে।

উপরোক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দের আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার কয়েকজন ছাত্রী বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে বহু সময় ব্যয় করে প্রবন্ধগুলির পাণ্ডুলিপি

ছাপাখানায় দেবার উপযোগী করে তৈরী করেছেন। আমি তাঁদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ও কল্যাণ কামনা করছি। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র অধুনা সহকর্মী শ্রীমান্ সুনীলচন্দ্র বিশী, এম, এস্-সি ছাপাবার সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করে আমার কষ্টের অনেক লাঘব করেছেন। প্রার্থনা করি তাঁর সর্বাঙ্গীন উন্নতি হোক। শ্রীযুত অসিতকুমার রায়, বি, এস্-সি, এম, এ সমস্ত প্রুফ সংশোধনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সমাজসেবার কাজে যাঁরা ব্রতী আছেন পুস্তকখানি পাঠ করে তাঁরা যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হন এবং যে সমস্ত বাস্তব সমস্যার তাঁরা সম্মুখীন হন সেগুলিকে মনোবিদ্যার দিক থেকে দেখবার কৌতূহল যদি তাঁদের আরও তীব্রভাবে জাগে তাহলেই আমার পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে মনে করব।

১ আগস্ট ১৯৪৯

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

সূচীপত্র

অনিচ্ছাকৃত

অনিচ্ছাকৃত

"সব দিক বিবেচনা করিয়া আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে এ অবস্থায় আপনার আদেশ পালন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আশা করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ আপনি মার্জনা করিবেন।" যাঁর আদেশ পালিত হয়নি তিনি হয়তো মার্জনা করলেন কিম্বা করলেন না। সে বিষয়ে উপস্থিত আমাদের কৌতুহল নেই কিন্তু এই 'অনিচ্ছাকৃত' যে সব অপরাধ ত্রুটি আমরা অনেক সময় করতে বাধ্য হই বলেই আমরা মনে করি সে সম্বন্ধে ভেবে দেখবার এবং বলবার বোধ হয় কিছু আছে।

অনিচ্ছাকৃত কত কাজই না আমরা দিনের মধ্যে করে বসি। সাড়ে পাঁচটার সময় সভায় উপস্থিত হবার কথা, এমন কতকগুলো কাজ এসে পড়ে যেগুলো শেষ করতে ছটা বেজে যায়, কাজেই সভায় উপস্থিত হতে দেরী হয়ে যায়—এ বিলম্ব অনিচ্ছাকৃত। অফিস থেকে বেরিয়ে আপনার জিনিসটি কিনবো বলে দোকানে যাচ্ছিলুম কিন্তু ধর্মতলার মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিশ গাড়ী এতক্ষণ আটকে রাখলে যে দোকানে যাবার আর সময় রইল না। আমার আবার সাতটার সময়ও আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল কি না, আপনার জিনিসটি কাজেই আর আনা হল না। এই

না-আনার ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত। এত কাজের চাপ যে আপনার চিঠির সময় মত উত্তর দিতে পারিনি—এই দেরী কাজেই অনিচ্ছাকৃত। লেখাটি নিয়ে যাবার জন্যে আপনাকে সোমবার আসতে বলেছিলুম—কিন্তু শরীর এতই খারাপ ছিল যে এ ক'দিন কিছুই করে উঠতে পারিনি—সোমবার আপনি এসে শূন্য হাতে ফিরে গেলেন। আপনি যাওয়া আসায় যথেষ্ট কষ্ট পেলেন বটে এবং বিরক্তও হলেন—কিন্তু কি করবো আপনার এই কষ্ট পাওয়া এবং বিরক্ত হওয়া আমার অনিচ্ছাকৃত। দুর্ঘটনা (accidents) যা সব ঘটে সবই অনিচ্ছাকৃত। কে আর চায় আগুনে তার হাতটা পুড়ে যাক্ বা ছুরিতে আঙ্গুলটা কেটে যাক্।

যে সব ব্যাপার অনিচ্ছাকৃত মনে করি সত্যিই কি সে সবই অনিচ্ছাকৃত? একটু ধীরভাবে বিশ্লেষণ করলে অনেক অনিচ্ছাকৃত ঘটনা যে ইচ্ছাকৃতই তা বুঝতে দেরী হয় না। আপনি হয়তো স্বীকারই করবেন যে ভদ্রলোকটি যখন আপনাকে তাঁর জিনিসটি কিনে আনতে বলেছিলেন তখনই একবার আপনার মনে হয়েছিল যে আপনি আনবেন না। হয়তো আগে একবার কোনও জিনিস তাঁকে কিনে এনে দিয়েছিলেন কিন্তু আজ কাল করে তিনি তার দাম আজ পর্যন্তও দেননি। তিনি যে দিতে পারেন না তা নয় কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক্ আপনি এখনও তার দাম পাননি। এই অভিজ্ঞতার অপ্রিয় স্মৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ সজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে থেকে আপনাকে তাঁর জন্যে এবার

জিনিসটি কিনতে দিলে না। যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনার সাতটার সময় দেখা করবার কথা ছিল তাঁর বাড়ী উপস্থিত হয়ে আপনি হয়তো দেখলেন সাতটা বাজতে তখনও পনেরো মিনিট দেরী আছে। কাজের চাপে যিনি সময় মত চিঠির জবাব দিতে পারেন না বলেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া যায় যে তিনি নিজেকে প্রতারণা করছেন। সময় মত উত্তর না দেবার কারণ তাঁর কাজের ভীড়ের মধ্যে নয়, অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।

নিজেকে পাঁচজনের কাছে জাহির করবার ইচ্ছা অল্প বিস্তর সব লোকের মধ্যেই আছে। তবে এর নানা রকম প্রকার ভেদ হয়। কারও কাছে ঘর সংসারের লোকেরাই, আত্মীয় স্বজনরাই "পাঁচজন"। সেই পাঁচজনের কাছে নিজেকে বড় করে তুলতে পারলেই তাঁর বাসনা চরিতার্থ হয়। বড় করে তোলবার প্রণালীও তাঁর সরল ও সহজসাধ্য। আবার কেউ চান সমাজের পাঁচজন তাঁকে বড় করে মেনে নিক। যাঁর সত্যি-কারের সামর্থ্য আছে তিনি তাঁর সামর্থ্যের বলে সমাজনেতার স্থান অধিকার করতে পারেন। যাঁদের সে সামর্থ্য নেই অথচ সকলের কাছ থেকে সম্মান দাবী করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাঁদেরই নানা রকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। অনেক সময় এই আকাঙ্ক্ষাই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হওয়ায়, চিঠি-পত্রের সময় মত জবাব না দেবার কারণ।

লোকে জানুক আমি সমাজের একজন কত বড় লোক, আমার কত কাজ, পাঁচজনে আমার উপরে কি রকম নির্ভর

করে। "আমি এইখানে আসবার জন্য বেরুচ্ছিলুম, ঠিক সেই সময়—স্যার ওমুক—চেনো তো?—টেলিফোন্ করলেন" ইত্যাদি এই রকমের গল্প আপনারা অনেক শুনেছেন। এ যেমন দর বাড়াবার এক রকম উপায় তেমনি যে দূরে আছে তার কাছে চিঠি মারফত "অনেক কাজের" একটা ইঙ্গিত দেওয়াও আর একটি উপায়।

অনেক সময় আমরা জেনেশুনেই এই সব পথ অবলম্বন করি। কোন কোন সময় ঠিক ইচ্ছা না হলেও স্বীকার করি যে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা ভাব ছিল বটে। তথ্যের দিক থেকে তাহলে একথা বলা যায় যে, যখন একটি প্রকাশ্য ইচ্ছা এবং একটি কথঞ্চিত প্রকাশ্য ইচ্ছার সংঘাত ঘটে তখনই "অনিচ্ছাকৃত" ঘটনার উদ্ভব হয়।

কিন্তু সমস্ত অনিচ্ছাকৃত ব্যাপারই কি এই কারণে ঘটে? ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে যখন কারুর হাত পা ভাঙ্গে, ষ্টোভ ফেটে গিয়ে যখন কোন তরুণী বা যুবতী পুড়ে যায়, এক কথায় যেগুলোকে আমরা আকস্মিক দুর্ঘটনা (accidents) বলি সেগুলোও কি ঐ একই কারণে ঘটে? এইসব ক্ষেত্রে এ তথ্য মেনে নেওয়া কি চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নয়? আপাতদৃষ্টিতে ত বটেই। কিন্তু একটু মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করলে তথ্যটি একেবারে আজগুবি বলে মনে না-ও হতে পারে। সংজ্ঞান স্তরের ইচ্ছার সঙ্গে নির্জ্ঞান স্তরের ইচ্ছার বিরোধের ফলে অনেক ব্যাপারই ঘটে। মানসিক রোগের লক্ষণের ভেতর দিয়ে নির্জ্ঞান স্তরের

ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে শুনলে হঠাৎ আজগুবি বলে মনে হয় কিন্তু এ যে সত্যি তা প্রমাণ হয়ে গেছে। সমস্ত দুর্ঘটনার মূলেও বিভিন্ন স্তরের ইচ্ছার সংঘাতের এই রকম একটি ব্যাপার আছে বলে অনেকে মনে করেন। নির্জ্ঞান স্তরের ইচ্ছা নানা রকম হতে পারে, যেমন নিজেকে জাহির করবার ইচ্ছা, যৌন ইচ্ছা, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি সংক্রান্ত ইচ্ছা। মোট কথা এসব ইচ্ছাগুলিই অসামাজিক। যাঁর ওপর আপনার বিদ্বেষ আছে তাঁর যাত্রার সময় হঠাৎ ছুরিতে আপনার নাকটা কেটে রক্তপাত হতে পারে। "আমার দাম তুমি কিছুতেই দিচ্ছোনা, আচ্ছা, আমার অবর্তমানে তুমি বুঝবে আমি কি ছিলুম"—এই ভাব থেকে আকস্মিক অপমৃত্যু ঘটা খুব অসম্ভব নয়।

শরীরের ওপর যে মনের যথেষ্ট প্রভাব আছে এ অতি প্রাচীন তথ্য। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে শরীরের ক্রিয়াকলাপ ইচ্ছার দ্বারা যথেষ্ট এবং কল্পনাতীত রকমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাল-মন্দ, স্বাস্থ্য-রোগ, ঘটনা-দুর্ঘটনা, সকলের মূলেই যে ইচ্ছার খেলা বর্তমান আছে তা আমরা ক্রমশই উপলব্ধি করছি। মনঃসমীক্ষণ আমাদের এ বিষয়ে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। হয়তো একদিন অনুভব করতে সমর্থ হবো যে শুধু ভীষ্মের নয়, আমাদের সকলের মৃত্যুই "ইচ্ছামৃত্যু"।

সমাজসেবক

মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন শরীরের অভ্যন্তরে তার যে বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে এবং তারা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে সে বিষয়ে তার ভাববার প্রয়োজন হয় না, ভাবেও না। কিন্তু যখন তার যকৃত বিকৃত হয়, বুকে ব্যথা ধরে, আহারে অরুচি দেখা দেয় তখনই যকৃত, হৃদ-যন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ ও তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাকে সচেতন হতে হয়। যন্ত্রগুলিকে আবার সহজ নিরাময় অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উপায় উদ্ভাবন করতে তখন সে যত্নবান হয়। এই যত্ন, এই চেষ্টা থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্রের যত ক্রমোন্নতি হচ্ছে, নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির যত আবিষ্কার হচ্ছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও ততই উন্নতি হচ্ছে। কারণ এ সবের সঙ্গে এর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। রোগের উপশমই এখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, ব্যাধির আক্রমণ থেকে মানুষকে কি করে রক্ষা করা যায় এটাই অধুনা তার একটা বড় রকমের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোটামুটিভাবে সমাজকে একটা প্রাণবান্ মানবশরীরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বহু সহস্র কোষ নিয়ে যেমন মানুষের শরীর তৈরী হয় বহু মানবের সমষ্টিতে তেমনি সমাজ গড়ে ওঠে। শরীরের প্রত্যেকটি কোষ, প্রত্যেকটি অঙ্গ পরস্পর

নির্ভরশীল। একটা দোষগ্রস্ত হলে সমস্ত শরীরই ক্রমশ দুষ্ট হয়ে ওঠে। পেটের বিরুদ্ধে হাত পা প্রভৃতি অবয়বের ধর্মঘট ও তার পরিণামের গল্প সকলেই জানেন। সমাজেও তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যান্য ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। সুতরাং কোন এক ব্যক্তির, কোন এক সম্প্রদায়ের ক্ষতি হলে সমস্ত সমাজেরই ক্ষতি হয়। শারীরিক ক্রিয়াকলাপের কতকগুলি নিয়মকানুন আছে। সেই নিয়মানুসারে যখন প্রত্যেক অঙ্গের কাজ হয়ে যায় শরীর তখন সুস্থ থাকে। কিন্তু সেই নিয়মকানুনের ব্যতিক্রম হলেই অসুস্থতা, ব্যাধি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। সমাজেরও তেমনি বিশেষ কতকগুলি বিধিনিয়ম আছে। সেগুলির ব্যতিক্রম ঘটলে সমাজে নানারকম অমঙ্গলের উদয় হয়। মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে, সুখ শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। যে সমাজে অধিকাংশ লোকই অসুখী এবং দুঃখ দারিদ্র্যের ভেতর দিয়েই জীবনযাপন করতে বাধ্য থাকে, সে সমাজ নিশ্চয়ই ব্যাধিগ্রস্ত। দারিদ্র্য ভিন্ন সামাজিক ব্যাধির আরও লক্ষণ আছে। সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌রা সে সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা করছেন।

লক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা করা যেমন প্রয়োজন, সমাজের দোষত্রুটি, ব্যাধি নিবারণ করার চেষ্টা করাও তেমনি দরকার। এই শেষোক্ত কাজটির নামই সমাজসেবা (Social service)। সমাজসেবকরা সমাজের সকল দোষ দূর করে মানুষ যাতে

সুস্থ সবল সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে তার চেষ্টা করেন। তাঁদের সমাজ-চিকিৎসক বলা যায়। এঁদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কি রকম প্রকৃতির লোক সমাজসেবার কাজে উপযোগী? প্রথমেই বলা যায়—যিনি সমাজসেবক হবেন প্রভূত সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। কারণ সমাজ ত কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। তাদের পরস্পরের মানসিক যোগাযোগই ত সমাজের ভিত্তি। সুতরাং সমাজের গ্লানির অর্থ—হয় সেই লোকগুলির গ্লানি অথবা তাদের পরস্পরের সম্বন্ধের বিকার, অথবা দুই-ই। সমাজসেবককে এই দোষযুক্ত লোকদের সঙ্গেই ব্যবহার করতে হয়। এদের সঙ্গে ব্যবহার করে এদের সরল পথে নিয়ে আসা আদৌ সহজ কাজ নয়। এ বিষয়ে কৃতকার্য হতে হলে চাই অশেষ সহানুভূতি এবং অসীম ধৈর্য। প্রকৃতির দিক থেকে আরও একটা গুণে গুণী হওয়া তাঁর আবশ্যক—সে গুণ ক্ষমাশীলতা। যিনি অন্য লোকের মানসিক দুর্বলতা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে না পারেন, ক্ষমার চক্ষে দেখতে অপারগ, তিনি সমাজসেবার কাজের উপযুক্ত নন।

কিন্তু শুধু এই মানসিক বৃত্তিগুলির অধিকারী হলেই যথার্থ সমাজসেবক হওয়া যায় না। যুক্তিযুক্ত বিচার করবার এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা এবং কতকগুলি বিষয়বিশেষের জ্ঞান অর্জন করা সমাজসেবকের প্রয়োজন। দুটিই সাধনা এবং সময়সাপেক্ষ। পাশ্চাত্যদেশে সমাজসেবার

কাজ প্রথমে লোকহিতৈষী ব্যক্তিগণের (Philanthropist) দ্বারাই আরম্ভ হয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের ধনী ব্যক্তিরা দাতব্য প্রতিষ্ঠান (Charitable Societies) স্থাপন করে দরিদ্রদের অর্থ সাহায্য করবার ব্যবস্থা করতেন। এটাই তখন সমাজ-সেবার একমাত্র পন্থা বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এর ফল সব সময়ে ভাল হত না। কোনরকম বিবেচনা না করে প্রার্থী-মাত্রকেই দয়াপরবশ হয়ে দান করারও কুফল শীঘ্রই দেখা যেতে লাগল। সমাজে অলস প্রকৃতি লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে এবং মিথ্যা অজুহাতে অর্থসংগ্রহের প্রবৃত্তি প্রবল হতে লাগল। মিথ্যা এবং আলস্য কোন সমাজের পক্ষেই কল্যাণকর নয়। সুতরাং ঐ ধরণের সমাজসেবায় Philanthropist-দের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে অশুভ ফলই ফলল। তখন দানের উপযুক্ত পাত্র কে তা বিচার করে দেখবার আবশ্যকতা সকলে অনুভব করল। এতে একদিকে সেবা সমিতির কাজ যেমন জটিল হয়ে উঠল তেমনি সাহায্যপ্রার্থীদের সাংসারিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য অধিকতর সেবকেরও প্রয়োজন হল। অনুসন্ধানের গভীরতা এবং বিস্তৃতির ফলে অনেক দিক দিয়ে মানুষের চোখ খুলে গেল। কেন এত লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সমাজের ব্যাধি কোথায় তা সকলে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করল। দেখা গেল নিরন্নকে অন্নদান করলেই বা বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিলেই সমাজের উপকার করা হয় না। নিরন্ন বা বস্ত্রহীন হওয়া সামাজিক রোগের লক্ষণ মাত্র, আসল রোগ নয়। সুতরাং মূলগত ত্রুটির

সংস্কার না করে কেবলমাত্র লক্ষণগুলিকে দূর করবার চেষ্টা করলে সমাজের প্রকৃত হিতসাধন করা যায় না।

সমাজের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা যেসব কারণে ঘটে মোটামুটি সেগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—মানসিক এবং পারি-পার্শ্বিক। দু'ভাগ হলেও তারা পরস্পর একেবারে সম্বন্ধবিহীন নয়। পূর্বে বলেছি কতকগুলি মানুষ এবং তাদের মধ্যে মানসিক সম্পর্কেই সমাজের ভিত্তি। যে সমস্ত মানসিক গুণাবলী আমরা বরণীয় বলে মনে করি প্রত্যেক মানুষই যদি সে সমস্ত গুণসম্পন্ন হয়—তা হলে সমাজ সুস্থ সবলই থাকে; অবশ্য যদি প্রতিকূল পরিবেশ মানুষের মনের স্বাভাবিক স্ফূরণের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি না করে। মানুষের মন এবং পরিবেশ এই দুটি সমাজের উপাদান। ইপ্সিত পথে মনের বিকাশ না হলে বা পরিবেশ অনুকূল না হলে সমাজ নানারকম ব্যাধির লীলাভূমি হয়। ধরুন, কোন সমাজে চুরি, ডাকাতি, খুন প্রায়ই হয় এবং আইনের চক্ষে যারা অপরাধী (Criminal) তাদের সংখ্যাই অধিক—সে সমাজ নিশ্চয়ই সুস্থ নয়। এই ধরণের সমাজ, সেবকদের একটা প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র। এই সমাজের প্রত্যেক মানুষ অপরাধ প্রবণতা নিয়েই জন্মেছে ধরে নিলে সমাজনিয়ন্ত্রক নেতাদের মনে আর কোন দ্বিধার সঞ্চার হয় না। তাঁদের কর্তব্য পালনে কোথাও ত্রুটি হয়েছে বিবেচনা করবার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং তাঁরা অপরাধীদের সম্বন্ধে কতকগুলি আইন জারি করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে তাঁদের কর্তব্যজ্ঞান অক্ষুণ্ণ

রাখেন। কিন্তু নতুন মনোবিদ্যা তাঁদের এই আরামদায়ক তত্ত্বটাকে রূঢ়ভাবে আঘাত দিয়ে তাঁদের সুখশান্তির অধুনা যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়েছে। আধুনিক মনোবিদ্‌রা স্বীকার করেন না যে ওরকম সমাজে যারা বাস করে এবং চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অশ্লীল ব্যবহার করে, অপরাধ-বৃত্তি তাদের সহজাত। অত্যন্ত অশুভ পরিবেশের মধ্যে বাল্যাবধি পালিত হলে দেবশিশুরও দুর্বৃত্ত দানবের মত দুর্ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু কেবলমাত্র পরিবেশই কি মানুষের অভ্যস্ত চিন্তাধারা, ক্রিয়াকলাপের জন্যে দায়ী? অপরাধীদের সহবাসে, বিকৃত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বর্ধিত হয় বলেই কি মানুষ অপরাধী হয়? অনেক বালক স্কুল থেকে পালিয়ে নানারকম অপকর্ম করে বেড়ায় এবং সময় সময় আইনের কবলেও এসে পড়ে। তাদের সকলের পরিবেশ যে মন্দ একথা বলা চলে না। তবু তারা ওরকম আচরণ করে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে আধুনিক মনোবিদ্যা তা দেখিয়ে দিয়েছে। সমাজের স্বাস্থ্য ভাল বা মন্দ মানুষের মন ও পরিবেশ উভয়ের উপর নির্ভর করে। রাজনীতি, শাসনপদ্ধতি, অর্থনৈতিক অবস্থা হল পরিবেশ। সমাজের হিতসাধন যাদের কাজ এইসব বিষয়ে মনোযোগী হওয়া তাদের প্রয়োজন। কিন্তু মানসিক প্রবৃত্তিগুলি শৈশব থেকে কি ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, মানুষের মন কি ভাবে কাজ করে—তার যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করাও সমাজসেবকের একান্ত প্রয়োজন। উত্তম পরিবেশের

মধ্যে থেকেও কোন বিশেষ কারণে একটি বালক বা বালিকার মনের অভিব্যক্তি নীতিনির্দিষ্ট পথে হল না। অভিভাবকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে সে পুরোপুরি অপরাধী (Criminal) হয়ে উঠল। কিন্তু যদি কেউ যথেষ্ট অনুসন্ধান করে সেই বিশেষ কারণটি আবিষ্কার করতে ও তা দূর করতে পারতেন তা হলে সেই বালক বা বালিকার মনের বিকাশ সুনীতির পথেই হতে পারত। এরকম ঘটনার অনেক দৃষ্টান্ত মনোবিদ্‌রা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। সমাজসেবকের তাই মনোবিদ্যা অধ্যয়ন করাও একান্ত আবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মনোবিদ্যার ওপর প্রধানতঃ ভিত্তি করে সমাজসেবার কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের সমাজ আজ জর্জরিত, নানারকম ব্যাধিগ্রস্ত—তাকে আবার সুস্থ করে তুলতে হবে। এই কাজে বহু সমাজসেবকের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রয়োজন। ভবিষ্যত সমাজসেবকগণ মনোবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করুন এবং নিজেদের প্রস্তুত করুন—এই আমাদের কাম্য।

সমাজ ও শান্তি

একটা কথা আছে, যে একা থাকে সে হয় খুব উঁচু ধরণের সাধুপুরুষ না হয় তার প্রকৃতি একেবারে জন্তু জানোয়ারের মত। He is either a saint or a beast. সাধারণ মানুষ সকলের সঙ্গে মিলেমিশেই থাকতে চায়। কিন্তু সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যেক লোককেই কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়, অনেক ইচ্ছা দমন করতে হয়, আবার সময় সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজ করতে হয়। কোন্ প্রবৃত্তি দমন করতে হবে, কোন্ ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে, ঐ সব সম্বন্ধে কতগুলি ধারণা আদিম কাল থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। এই ধারণাগুলো সব সমাজেই যে একই রকম তা অবশ্য নয়। বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সমাজের ক্রমপরিণতি হয়েছে বলে, সামাজিক রীতি নীতির যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ভিন্ন ভিন্ন সমাজে দেখা যায়। ঐতিহ্য (traditions), প্রচলিত রীতিনীতি, বিধিনিষেধ প্রভৃতির ভেতর দিয়েই মূলগত ধারণাগুলি প্রকাশ পায়, তাই এই সবের দ্বারাই সামাজিক আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ লোকেরা তাদের নিজেদের সমাজের বিধিনিষেধগুলি মেনে নেয় এবং যে প্রথাগুলি তাদের সমাজে প্রচলিত, সেই অনুসারে

চলাই কর্তব্য বলে মনে করে। যারা মানে না, সমাজ তাদের অপরাধী বলে বিবেচনা করে এবং তাদের নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা করে।

এ পর্যন্ত যা বললুম তা সবই বাস্তব ঘটনা এবং আপনাদের অজানা কিছুই নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই জেনে নেওয়া এবং এই শাস্তির ব্যবস্থার মধ্যে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক সমস্যা আছে। লোকে মেনে নেয় কেন? আপনি আপনার সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে হলে ইতস্ততঃ করেন কেন? কে আপনাকে মেনে নিতে বাধ্য করে? কবে আপনি এই গতানুগতিক পন্থায় চলতে আরম্ভ করেছেন? সব নিয়মকানুনগুলি কি আপনি বুদ্ধির সাহয্যে বিচার করে দেখে তারপর মানতে আরম্ভ করেছেন? যারা মানে তাদের সম্বন্ধে যেমন এই সব প্রশ্ন তোলা যায়, তেমনি যারা মানে না তাদের সম্বন্ধেও অনেক জানবার কথা আছে। কেন তারা মানে না? চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সমাজের ক্ষতিকর এবং নিন্দার্হ কাজ কোন কোন লোক করে কেন? ব্যাভিচার, খুন, জখম প্রভৃতি অনেক রকমের অপকর্ম সব সমাজেই কিছু কিছু হয়। যারা এই সব কাজে লিপ্ত থাকে সমাজ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ, বিচারালয়, হাজত, কারাগার, ফাঁসিকাঠ এই শাস্তিব্যবস্থারই নিদর্শন। সমস্যা কিন্তু এখানেও আছে। এই শাস্তিব্যবস্থার ভিত্তি কি? A tooth for a tooth? তুমি যদি আমার ক্ষতি কর, আমিও তোমার ক্ষতি করব, এই

মনোভাব থেকেই কি শাস্তির উৎপত্তি? তারপর, শাস্তি দেওয়ার ফল কি হয়? শাস্তি ভোগ করে অপরাধীর চরিত্র কতখানি সংশোধিত হয়—আর শাস্তি দিয়ে সমাজ কতখানি উপকৃত হয়? যে উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হয় প্রচলিত শাস্তি ব্যবস্থায় সে উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়? এখন এই সব সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক্।

কেউ কেউ বলেন প্রতিহিংসা মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি-instinct, এবং এই বৃত্তি থেকেই শাস্তির উৎপত্তি। কিন্তু প্রতিহিংসা সহজাত বৃত্তি বলে ধরে নেবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। শাস্তি দেওয়ায় প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির ইঙ্গিত হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিহিংসাই যে সব শাস্তির উৎপত্তির কারণ তা বলা যায় না। পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়, কেউ গোষ্ঠীর ক্ষতিকর কোন কাজ করলে গোষ্ঠীর ভিতর সে যাতে আর কোন কালে উপস্থিত হতে না পারে তার একটা ব্যবস্থা করা হত। তা তাকে গোষ্ঠী থেকে নির্বাসন করেই হউক বা একেবারে হত্যা করেই হউক। গোষ্ঠী থেকে সরিয়ে দেবার মূলে দু'তিন রকমের মনোভাব মিশ্রিত থাকতো। অপরাধীকে শত্রু বলে বিবেচনা করা হত। নিধনই শত্রুর একমাত্র ব্যবস্থা। অপরাধীকে আবার অশুচি বলে অন্য লোকেরা মনে করতো। গোষ্ঠীর মধ্যে থাকলে তার সংস্পর্শে অন্য সকলেও অশুচি হয়ে যাবে, গোষ্ঠীকে শুচি রাখবার জন্যে তাই অপরাধীকে গোষ্ঠীচ্যুত করা দরকার। অপরাধীকে বলি দিলে দেবতারা

সন্তুষ্ট হবেন এ ভাবটাও কিছু কিছু থাকতো। সুতরাং তাকে যে হত্যা বা বিতাড়িত করা হত তা যে প্রতিহিংসা-পরবশ হয়েই করা হত তা বলা যায় না।

অপরাধ ঠিক কাকে বলে তা নির্ণয় করবার চেষ্টা সব দেশেই হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে মতামতও অনেক আছে। অপরাধের একটি লক্ষণ সম্বন্ধে সকলেই একমত। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধ কাজই অপরাধ এবং যে সেই রকম কাজ করে সেই অপরাধী। এটা অবশ্য খুব ব্যাপক অর্থ। ইংরাজীতে যাদের Criminals বলি তারা এক শ্রেণীর অপরাধী, কিন্তু অপরাধীমাত্রেই Criminal নয়। যে পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা করে না, সমাজের চক্ষে সে অপরাধী বটে কিন্তু Criminal সে নয়। সব দেশের রীতিনীতি বিধিনিষেধ একরকম নয় বলে এক কাজ সব দেশেই অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না, যেমন আত্মহত্যা ইংলণ্ডে অপরাধ, জাপানে কিন্তু নয়।

এই অর্থে অপরাধ কথাটি ব্যবহার করলে বলা যায় যে অপরাধ-প্রবণতা মানুষের সহজাত বৃত্তি। শিশুমাত্রই কতক-গুলি বৃত্তি নিয়ে জন্মায়—কতকগুলি ভাল, কতকগুলি মন্দ। অর্থাৎ সমাজ কতকগুলিকে বাড়তে দিতে চায় আর কতক-গুলিকে নষ্ট করতে চায়। প্রত্যেক নবজাত শিশুই একটি 'angel' দেবশিশু বিশেষ Rousseaur এ ধারণাটিও যেমন ভুল, প্রত্যেক মানুষই 'is an wolf to another man', Hobbes-এর এ কল্পনারও তেমনি কোন ভিত্তি নেই।

স্বার্থপরতা সহজাত। অনেক সামাজিক অপরাধের ভিত্তি এই স্বার্থপরতা। সুতরাং বলা যায়, অপরাধ-প্রবণতা সহজাত। যে সমস্ত বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হলে ভবিষ্যতে সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা অনিবার্য, সেইগুলি দমন করার চেষ্টা করা শিশুদের শিক্ষার একটি গোড়ার কথা। একটি শিশু যখন আর একটি শিশুর কাছ থেকে জোর করে খেলনা কেড়ে নেয় তখন সে অপরাধ করে না, কারণ ন্যায়-অন্যায় বোধ তখনও তার হয় নি। এই ন্যায়-অন্যায় বোধ (Moral sense) যতক্ষণ না তার জন্মায় ততক্ষণ তার কাজ অপরাধ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না। প্রথমে বাবা, মার নিষেধের জন্যে অনেক স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির পরিচায়ক কাজ থেকে সে বিরত হয়। ক্রমে সে নিজের অহম্ (Ego)-এর এক অংশকে এই নিজেকে নিষেধ করবার ভার দেয়। যে অংশ এই ভার নেয় তাকে বলে অধিশাস্তা (Super Ego)। এই অবস্থা যখন আসে তখন আর বাইরের কারও নিষেধ করবার প্রয়োজন হয় না। এই অধিশাস্তাই হয় তখন তার নীতিজ্ঞান, বিবেক, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতির ভিত্তি। সুতরাং অধিশাস্তার গঠন ও স্বরূপের ওপর তার ভবিষ্যৎ চরিত্রের গুণাগুণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উপযুক্ত ভাবে লালন পালন না করার দোষে অনেক সময় শিশুর অধিশাস্তার গঠন দুর্বল হয়, সে ক্ষেত্রে শিশুর অপরাধী (Criminal) হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। পিতা-মাতার সতর্ক দৃষ্টি, উপযুক্ত শিক্ষা, সুস্থ সবল অধিশাস্তা গঠনের একমাত্র উপায়।

শিশুকে সাজা দেওয়ার কোন কথা হতে পারে না তবে তকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কোন অন্যায় অপকর্ম থেকে শিশুকে বিরত করতে হলে এমন কোন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে অপকর্মের ফলে তাকে একটু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যন্ত্রণার কথা মনে হলে সে ভবিষ্যতে সে কাজ থেকে বিরত হতে পারে কারণ যন্ত্রণা ভোগ করতে কেউই চায় না, শিশু ত নয়ই। কিন্তু এখানে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যন্ত্রণা কি ধরণের হবে এবং তার পরিমাণ কতখানি হবে সে বিষয়ে অভিভাবকদের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। খুব রেগে গিয়ে বেদম প্রহার করলে কোন ফলই হয় না। এই উপায়, যাকে ইংরাজীতে Conditioning বলে, অল্প বয়স্ক শিশুদের বেলায় কার্যকারী হয় বটে, কিন্তু একটু বয়স হলে, একটু বিবেচনা করতে শিখলে তখন আর এ উপায়ে কোন কাজ হয় না। কারণ বালক তখন অপকর্ম করার ফলে যে যাতনা, সেটা কি করে এড়িয়ে যাওয়া যায় তারও একটা উপায় উদ্ভাবন করে নেয়।

সমাজ যে শাস্তির ব্যবস্থা করে তার মূলে কোন একটি মনোবৃত্তি আছে এ ধরে নেওয়া ভুল। কোন কোন জায়গায় শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে বজায় রাখা, অপরাধীকে সরিয়ে দিয়ে। এখানে অপরাধী আসল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপার সমাজ। আবার এও অনেকে বলেন শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা, অথবা তাকে পুনরায় ঐ কাজ করবার সুযোগ না

দেওয়া, অথবা প্রতিশোধ নেওয়া কিম্বা অন্য লোককে ভয় দেখিয়ে ঐ রকম কাজ থেকে বিরত করা ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে শাস্তি-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিতে এই রকম একাধিক বৃত্তি আছে বলেই মনে হয়। এই চিরাচরিত ব্যবস্থায় কাজ কতদূর হয়, উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয় তা বিবেচনার বিষয়।

আধুনিক মনোবিদ্যা সমস্ত অপরাধতত্ত্বের ভেতর একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। পুরান পথে চলে কোন ফল হচ্ছে না তা যেমন একদিকে দেখিয়ে দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি কিভাবে অগ্রসর হলে ফল হতে পারে তার ইঙ্গিতও দিয়েছে। প্রথমেই বলি, যাকে অপরাধী বলে ধরে এনে শাস্তি দেওয়া হয় তার মানসিক অবস্থা কি রকম, বাস্তবিক সে তার কাজের জন্য দায়ী কিনা সেটা যে বিবেচনা করা উচিত মনোবিদ্যা এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। উদ্দাম উন্মাদ অবস্থা ছাড়াও অনেক মানসিক রোগ এমন আছে যাতে রোগী তার কাজকর্মের ওপর সমস্ত শাসন হারিয়ে ফেলে। একজন লোক বাড়ী থেকে বেরুতে হলেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক থেকে একশ' অবধি একবার গুণে নেয়। একজন রাস্তায় প্রত্যেক Lamp post টিতে একটি 'X' চিহ্ন দিয়ে যায়; যত চেষ্টাই করুক কিছুতেই সে নিজেকে দমন করতে পারে না। একটু বেশী মাত্রায় এগুলে এই ধরণের রোগীরা এমন অনেক কাজ করে বসতে পারে যা সমাজের নীতি বিরুদ্ধ। শাস্তি দেবার আগে তাদের মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

সৌভাগ্যের কথা এই যে আজকাল বিচারকগণও এই কথাটার যাথার্থ্য উপলব্ধি করেন এবং সন্দেহের কোন কারণ থাকলেই তথাকথিত অপরাধীকে 'নজরে' রাখবার এবং মানসিক ব্যাধি চিকিৎসকদের দিয়ে পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা করেন। সৌভাগ্যের কথা বলছি এই জন্যে যে কিছুদিন আগেও অপরাধের সঙ্গে দায়িত্ববোধের যোগাযোগের কথা একেবারেই বিবেচিত হত না। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটা কুড়ুলেতে একজন লোকের আঘাত লাগে বলে Athens সহরের বিচারালয়ে কুড়ুলের বিচার হয়। কুড়ুল দোষী সাব্যস্ত হয়, সমস্ত নিয়ম-কানুন বজায় রেখে তাকে দেশের সীমানা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ওপারে ফেলে দেওয়া হয় অর্থাৎ তার নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। সেদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডে কোন গাছ মানুষের উপর ভেঙ্গে পড়লে, তাকে বাজেয়াপ্ত করা হত এবং বিক্রী করে দেওয়া হত। Switzerlandএ একটী শুয়ার একটি ছোট ছেলেকে মেরে ফেলেছিল বলে তার বিচার হয় এবং হুকুম হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু হয়—ততক্ষণ তাকে ফাঁসিকাঠে টাঙ্গিয়ে রাখা হবে। এ অবস্থা থেকে আমরা যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

শাস্তির ফল কখন হয়? যখন অপরাধী নিজে মনে করে যে সে সত্যই অপরাধী। তার নিজের যদি অপরাধ-জ্ঞান না থাকে তাকে শাস্তি দিলে, সে সমাজের ওপর অধিকতর বিরূপ হয় এবং সমাজের বিধি নিষেধকে আরও অবজ্ঞার চোখে দেখতে থাকে। ভবিষ্যতে তার আবার অপরাধ করবার

সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। শাস্তির ফল একেবারে উল্টো হয়। অপরাধের তুলনায় শাস্তির গুরুত্ব যদি বেশী হয় তা হলেও ঠিক এই রকম ফল হয়। যেখানে অপরাধ জ্ঞান থাকে সেই-খানেই শাস্তি কার্যকরী হয়। সুতরাং শাস্তি দেবার সময়ে এ বিষয়েও দৃষ্টি রাখা উচিত—অপরাধীর মনে এ বিশ্বাস জন্মান উচিত যে সে সত্যই অপরাধ করেছে। এটা খুব ব্যাপক তথ্য। কি করে একজন অপরাধীর মনে সে বিশ্বাস আনা যেতে পারে সেটা অবশ্য বিভিন্ন অপরাধীর বেলায় বিভিন্ন রকমের হবে। মনোবিদ্যা এখানে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যেখানে অপরাধজ্ঞান আছে, অন্য কেউ শাস্তি না দিলেও অপরাধী নিজেই নিজেকে শাস্তি দেবার উপায় উদ্ভাবন করে। সে প্রায়শ্চিত্ত করে।

মনোবিদ্‌দের আবিষ্কারের ফলে এখন যে নীতি গ্রহণ করবার কথা Criminologist-দের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে, একদিকে অপরাধীকে ভাল করে বোঝা অর্থাৎ তার 'ব্যক্তিত্ব' (personality) বিশদভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন এবং অন্যদিকে সমস্ত সামাজিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই দু'টি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারলে তবেই শাসন সংশোধন প্রভৃতির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারবে। এই জ্ঞান অর্জনের দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়াই এখন কর্তব্য। এই জ্ঞানলাভ যত করতে পারব উন্নতির ব্যবস্থা ততই আয়ত্তে আসবে কারণ knowledge is power, জ্ঞানই শক্তি।

সমাজ ও মনোবিদ্যা

কতকগুলি লোকের একত্র সমাবেশ মানেই সমাজ নয়। সেই সমবেত লোকগুলির মধ্যে যতক্ষণ না একটা মানসিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ততক্ষণ সমাজ গড়ে ওঠে না। পরস্পরের ভেতর চিন্তা, আদর্শ, উদ্দেশ্য প্রভৃতির মিল, কার্যধারার ঐক্য, ভাবের আদান প্রদান যখন কোন সমষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তখনই সেই সমষ্টিকে সমাজ বলে বর্ণনা করা যায়। অবশ্য এই ঐক্যের ক্রম (grade) আছে। এক সমাজের সব লোকেদের মধ্যে যে সব সময়ে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল হতে হবে তা নয়। তবে এই ঐক্যের ক্রমের উপরই যে সমাজ বন্ধনের দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে এ কথা ঠিক। পৃথিবীতে তাই নানারকমের সমাজ আমরা দেখতে পাই। কোন সমাজের ভিত্তি এতই প্রবল যে বাইরে থেকে নানারকমের আক্রমণ সত্ত্বেও সে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আবার কত সমাজ সামান্য আঘাতেই চূরমার হয়ে গেছে। যাই হোক, এই ভাঙ্গাগড়া এবং স্থায়ী হয়ে থাকায় মূল কথাই হচ্ছে সমাজের পরস্পরের ভেতর মানসিক যোগাযোগের গভীরতা। মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করে মনোবিদ্যা, কাজেই সমাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মতভাবে অধ্যয়ন করতে হলে মনোবিদ্যাকে এড়িয়ে

যাওয়া চলে না। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্ক তাই খুবই ঘনিষ্ঠ।

মানুষের ক্রম পরিণতির ইতিহাসে সমাজের স্থান কোথায়? মানুষ কি গোড়া থেকেই সমাজে বাস করত, না কোন এক সময়ে কোন এক অবস্থায় পড়ে স্বার্থান্বেষী মানুষ পরহিতকামী হয়ে উঠেছিল? নৃতত্ত্ববিদ্‌রা আদিকালের আদিমজাতিদের নানারকম সমাজবিধির কথা আমাদের জানিয়েছেন। আজকের সমাজ আদিকালের সমাজ থেকে অনেক তফাৎ। এই বিভিন্নতার সৃষ্টি কি করে হল? পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক ঘটনাবলীই কি এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ? তা বলা যায় না। তখনকার লোকেদের মনের ওপর নৈসর্গিক ব্যাপারগুলি কতখানি এবং কি ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটা যতক্ষণ না বুঝতে পারা যায়—ততক্ষণ সমাজের ক্রমপরিণতির সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। এইখানে সমাজতত্ত্বের সঙ্গে মনোবিদ্যার আর একটি যোগসূত্র আমরা দেখতে পাই।

প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি রীতিনীতি আচার ব্যবহার ধর্মানুষ্ঠান বিধিনিষেধ প্রবর্তিত আছে। এগুলি অবশ্য সব সমাজে একরকম নয়। অনেক ভূপর্যটক বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহারের চিন্তাধারা প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। অবশ্য বর্ণনা অনেক রকমের আছে। বহুদূর থেকে এসে সাতদিন ভারতবর্ষ বেড়িয়ে দেশে ফিরে গিয়ে ভারতবাসীদের রীতিনীতি, ধর্মানুষ্ঠান, অভ্যাস,

রাজনীতি, চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করা এক রকম বর্ণনা। আবার Livingstone প্রভৃতি লোকেদের মত নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আফ্রিকার জঙ্গলে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে বছরের পর বছর অতিবাহিত করে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার প্রচার করা—সেও একরকম বর্ণনা। আমি এই শেষোক্ত ধরণের বর্ণনার কথাই বলছি। এই বর্ণনা অতিশয় মূল্যবান্। কিন্তু কোন সমাজকে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে বুঝতে হলে শুধু এই বর্ণনাতেই কি ক্ষান্ত থাকা যায়? 'কি'র পরে স্বভাবতই প্রশ্ন এসে পড়ে 'কেন'? এই 'কেন'র উত্তর দিতে আবার আমাদের মনো-বিছার ক্ষেত্রে এসে পড়তে হয়।

ধরুন, ধর্মানুষ্ঠানের কথা। ভারতবাসীদের ভেতর যাঁরা হিন্দু তাঁরা মন্দিরে যেভাবে পূজা করেন, মুসলমানেরা মসজিদে সেভাবে প্রার্থনা করেন না। (আমি এখানে সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের কথা বলছি—ব্যক্তিগত ধারণার কথা বলছি না।) খৃষ্টান, জৈন, পার্সি প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মকর্মের ধারা ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। বিবর্তনবাদীরা এই বিভিন্নতার কারণ হয়ত বিশদভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হবেন। তাঁদের এই ব্যাখ্যাতেও মানসিক ঘটনাবলীর আলোচনা করার কিন্তু প্রয়োজন হবে। উপরন্তু বিবর্তনবাদের আশ্রয় নিলে,—তা আমাদের নিতেই হবে বলে মনে করি—একটি গোড়ার কথায় আমরা এসে পড়ি। এই বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের মূল উৎস কোথায়? এমন কি

কোন সময় ছিল যখন কেবলমাত্র একরকম ধর্মানুষ্ঠানই প্রচলিত ছিল? তারও আগে কোন সময় কি ছিল যখন ধর্মভাব বলে যাকে বর্ণনা করি তা কারুর মনেই ছিল না। যদি এরকম ধর্মহীন স্থান, কাল, পাত্র ছিল মনে করবার যথেষ্ট কারণ থাকে তাহলে কোন্ জায়গায় কার মনে, কি অবস্থায় ধর্মের মনোভাব প্রথম জাগল? কি রকম--- মানসিক অভিজ্ঞতা থেকে এর উৎপত্তি?

এ প্রশ্নগুলি অনেকের কাছেই হয়ত তুচ্ছ বলে মনে হবে। তাঁদের মতে ধর্ম সম্বন্ধে এ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করা শুধু অন্যায় নয়, একেবারে নাস্তিকতার পরিচয়। যাঁরা এরকম মনে করেন তাঁদের সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই। যে ধর্মবিশ্বাস তাঁদের মনে শান্তি এনে দিয়েছে, যার ফলে তাঁরা তাঁদের সংসার যাত্রা শান্তিতে, নির্বিঘ্নে সমাধা করে যেতে সমর্থ হচ্ছেন। সে বিশ্বাসে আঘাত দেবার কোন অধিকার আমার নেই, বরং আমি সে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি অনেক লোক আছেন যারা প্রচলিত ধর্মে এবং ধর্মানুষ্ঠানে আদৌ আস্থাবান্ নন, অথচ কাজে সে ভাবটা প্রকাশ করতে চান না। এখন এই ধরণের লোকের সংখ্যাই বোধ হয় বেশী। তাঁদের এই রকম প্রাণহীন ধর্মানুষ্ঠান করে যাওয়ার তীব্র নিন্দা করতেও আমি পারি না, কারণ সমাজ যেটা মেনে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে যেতে হলে যথেষ্ট মনের জোরের দরকার। ক্বচিৎ কদাচিৎ এ রকম মানসিক শক্তিসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে আসেন। যুগে যুগে

ভারতবর্ষে এই ধরণের মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে ; আমরা তাঁদের অবতার বলি। যাই হোক যাঁরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন না, এবং এই জন্যে একটা দ্বিধা নিয়েই যাঁদের জীবন কাটাতে হয় তাঁদের কাছে আমার প্রশ্নগুলি বোধহয় একেবারে নিরর্থক মনে হবে না। বরং প্রশ্নগুলি আলোচিত হলে তাঁদের সমস্যার সমাধানের হয়ত একটা পথ তাঁরা খুঁজে পেতে পারেন। এই সব প্রশ্ন নিয়ে তর্ক বিতর্ক এ পর্যন্ত কিছু হয় নি, এ কথা কেউই বলবে না। চিন্তাশীল দার্শনিকরা, নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন. এবং বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি যখন মানসিক তখন মনোবিদ্যার দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশ্ন এবং তথ্যগুলি আলোচনা করা সঙ্গত এবং সময়োপযোগী বলেই মনে করি। আধুনিক মনোবিদ্যা মনের অনেক রহস্যময় ব্যাপারের ওপর আলোকপাত করেছে, অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে এবং মনের কার্য-ধারার এ যাবৎ অজ্ঞাত অনেক প্রণালী আবিষ্কার করেছে। সুতরাং ধর্ম এবং ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে যে নতুন কথা কিছু বলতে পারবে এ ধারণা করা খুব অযৌক্তিক নয়। সব দেশেই, সব ধর্মেই এক একটি অনুষ্ঠানের পেছনে অনেক কাহিনী, অনেক গল্প ধারণা প্রভৃতি আছে। এই সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী, প্রচলিত গল্পগুলি, যেগুলি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের ভিত্তি সে গুলি মনোবিদ্যার দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে অনুষ্ঠানগুলির যে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এবং কারণ (Raison d'etre) পাওয়া যাবে

এবং কাজেই অনেক সংশয়ের যে সমাধান হবে তা খুবই আশা করা যায়। পাশ্চাত্য দেশের মনোবিদ্‌রা এই কাজে ইতিপূর্বেই হস্তক্ষেপ করেছেন। আমাদের দেশে এই ধরণের কাজের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। মনীষীদের মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হলে শীঘ্রই অনেক প্রচলিত অনুষ্ঠান, কাহিনী প্রভৃতির মনোবিদ্যার দিক থেকে সদ্‌ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে বলে মনে করি। সম্প্রতি 'উজ্জ্বল ভারতে' শ্রীরাধা প্রবন্ধে লেখিকা মনোবিদ্যার সূত্রের সাহায্যে রাধাচরিত্র বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন দেখে আনন্দিত হলুম। * প্রবন্ধে লেখিকার মূল বক্তব্যটি আরও একটু স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলে বোধ হয় ভাল হত। তবুও তাঁর এই নতুনভাবে অগ্রসর হওয়ায় ইচ্ছা ও সাহসকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমাদের মূল আলোচনার বিষয় থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। আবার এখন আসল বক্তব্য বিষয়ে ফিরে যাই। ধর্মানুষ্ঠান সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি। রাষ্ট্র, নীতি, শিক্ষা, বিবাহ, পারিবারিক জীবন প্রভৃতিও সামাজিক ক্রিয়াকলাপেরই অন্তর্ভুক্ত। এ সবেরও ভাঙ্গাগড়া আদিকাল থেকে হয়ে আসছে। বিংশ শতাব্দীতে এই ভাঙ্গাগড়া আর আমরা দৈব বা নৈসর্গিক ঘটনাবলীর ওপর ছেড়ে দিতে চাই না; আমরা এদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। তাই পরিবর্তনের মূল সূত্র খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি। কেউ বলেন মূল সূত্র

* উজ্জ্বল ভারত, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫

হচ্ছে পরিগম (Environment), কেউ বলেন বংশানুক্রম (Heredity) এই পরিবর্তনের কারণ ; কারও মতে জড়পদার্থের বিবর্তনতত্ত্বের সাহায্যে পৃথিবীর ইতিহাস, মনুষ্যত্বের বিকাশ, সবই পরিষ্কার বোঝা যায় ; আবার কার-ও ধারণা চিৎশক্তির (Consciousness) ক্রম স্ফুরণই পরিবর্তনের—তা জড় জগতেরই হউক বা মানুষের এবং মানুষের তৈরী সমাজ, রাষ্ট্রতন্ত্র প্রভৃতিরই হোক—একমাত্র সঙ্গত ব্যাখ্যা। আমার এক বন্ধু যিনি বিজ্ঞান এবং এই বিবর্তন প্রভৃতি অধ্যয়ন করে এ যাবৎ জীবন যাপন করে এসেছেন, তিনি আজকাল এই সব প্রশ্ন উঠলেই পাণ্ডিত্যাভিমানীদের প্রতি একটু কটাক্ষ করেই বলেন—এসব তত্ত্বের ভেতর খুঁজলে কোন কিছুই কোন দিনই বুঝতে পারবে না ; এপথ ছেড়ে শ্রীভগবানের আরাধনা কর ; তাঁর করুণা লাভ করতে সমর্থ হলে তখন হৃদয়ে অনুভব করবে যে, এ সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই লীলা। তিনি আরও বললেন, কথাটা যদিও পাগলামির মত শোনায় কিন্তু এ ভিন্ন আর গতি নেই এটা স্থির জেনো।

ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে যে ধরণের প্রশ্ন আমাদের মনে জেগেছিল, অনুরূপ প্রশ্ন এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তোলা যায়। সম্প্রতি মনঃস্তত্ত্বের দিক থেকেও রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। বিদ্রোহ, যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি সমাজের ব্যাধিসমূহের পেছনে কি মানসিক ঘটনাবলী দ্বন্দ্ব প্রভৃতি আছে, তা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই অনুভব করছেন। খবরের

কাগজে দেখলুম পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের অন্তরায় কি, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে বিরোধের মূল উৎস কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্নের অনুসন্ধানের জন্যে বিভিন্ন মহাদেশের কয়েকজন মনোবিদ্ বদ্ধপরিকর হয়েছেন এবং প্যারিস সহরে তাঁরা একত্রে মিলিত হয়েছেন। তাঁদের অনুসন্ধানের আশু ফললাভের কোন আশাই নেই—তা সহজেই বোঝা যায়; কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই ধরণের অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা যে অনেকে উপলব্ধি করেছেন এইটাই সুখের বিষয়। সমাজের কোন সমস্যারই সমাধান হয় না যদি আমরা কেবল বাইরের জিনিসের এবং পরিগমের দিকে মনোযোগ দিই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া যখন পূরাদমে চল্‌ছিল মহাত্মাজী তখন বলেছিলেন—যতক্ষণ পর্যন্ত 'হৃদয়ের পরিবর্তন' (change of heart) না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ দ্বন্দ্ব কিছুতেই মিটবে না। শুধু বিদ্রোহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ইত্যাদি নয়—শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজেও মনোবিদ্যা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। কোন একটি বৈদেশিক শাসনতন্ত্র, শিক্ষা-পদ্ধতি হুবহু আমাদের দেশে আমদানী করবার চেষ্টা করলে সুফলের আশা কখনই করা যায় না। তাই কর্তৃপক্ষদের বক্তৃতার ভেতর ভারতবাসীদের Psychology কথাটি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। এই দেশের লোকের Psychology অধ্যয়ন করার ব্যাপারটি বক্তৃতার গণ্ডি পেরিয়ে যতশীঘ্র বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নেমে আসে ততই মঙ্গল। একটি দৃষ্টান্ত দিই। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কতকগুলি প্রথা অনেক দিন

থেকে একভাবেই চলে আসছে। রাষ্ট্রের শাসন যাঁদের হাতে তাঁরা কতকগুলি আইনকানুন বেঁধে দিয়েছেন ; সেই অনুসারেই বিচারকগণ শাস্তি দিয়ে আসছেন। কিন্তু সেই শাস্তিবিধানের ব্যবস্থায় সমাজ কতখানি উপকৃত হয়েছে? কর্তৃপক্ষরা উপলব্ধি করেছেন যে এই প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। তাই তাঁরা Jail Committee গঠন করছেন এবং জেলগুলিকে Reformatory-তে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। এই ব্যাপারে মনোবিদ্‌দের সাহায্য আবশ্যক, অপরাধীদের (Criminals) মনঃস্তত্ত্ব অতিশয় জটিল। তাদের মনের পরিবর্তন করবার কাজ বিশেষজ্ঞদের, যাঁরা বিশেষ-ভাবে এ বিষয়ে অধ্যয়নাদি করেছেন, তাঁদের হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত।

শিক্ষা ব্যাপারে মনোবিদ্‌দের আবিষ্কারগুলির দাম শিক্ষকমাত্রেই আজকাল উপলব্ধি করেন। শিক্ষামন্ত্রীদের এই আবিষ্কারগুলি কাজে লাগাবার কিছু কিছু চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলবার উপস্থিত প্রয়োজন নেই। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অন্যত্র করেছি *

সামাজিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানটি এইভাবে মনোবিদ্যার দিক থেকে অধ্যয়ন করবার চেষ্টা করলে সমাজের পক্ষে তার ফল ভালই হবে। কারণ, প্রথমেই আমরা দেখেছি সমাজের ভিত্তি হচ্ছে মানসিক ঘটনাবলী। সুতরাং সেই

* মনঃসমীক্ষণ। রঞ্জন পাবলিশিং।

ঘটনাবলী মনোবিদ্যার সাহায্যে যতই অধ্যয়ন করা হবে ততই সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে। আর জ্ঞানই ত শক্তি। শক্তি অর্জন করতে পারলে সমাজের গতি বাঞ্ছিত পথে চালিত করতে সমর্থ হবে। 'মিথ্যা কথা বলিও না', 'গুরুজনদের সম্মান করিও', প্রভৃতি বাক্য প্রত্যেক শিশুই ছেলেবেলায় শোনে। কিন্তু সে শোনার ফল কমই দেখা যায়। কেন এমন হয়? বক্তৃতায়, খবরের কাগজে 'ধর্মঘট কোরো না', 'উৎপাদন বাড়াও', 'সহযোগিতা কর' প্রভৃতি বাক্যের ত আজকাল বহুল প্রচার দেখছি। কিন্তু সেই অনুসারে কাজ কেন হচ্ছে না। ডাকবার মত ডাকতে পারলে নাকি ভগবানও লুকিয়ে থাকতে পারেন না। এ ধারণাও বোধ হয় অমূলক নয় যে শোনাবার মত করে শোনাতে পারলে বলবার মত করে বলতে পারলে লোকে শুনবেই। এবং সেই অনুসারে কাজও করবেই। কি বলতে হবে, শোনাতে হবে, শেখাতে হবে এবং কি করে বলতে হবে, শোনাতে হবে, শেখাতে হবে মনোবিদ্যা তা আমাদের যে ভালভাবেই শিখিয়ে দিতে পারবে সে বিষয়ে আজ আর সংশয় করবার কিছু নেই।

কারাবন্ধন

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজ্যশাসনের বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে। কিন্তু শাসনপন্থা যে ধরণেই হউক সব শাসনতন্ত্রের আইন-কানুনের মধ্যেই অপরাধীকে কারাগারে নিক্ষেপের একটা ব্যবস্থা আছে। কোন্ অপরাধে কারাদণ্ড হওয়া উচিত আর সে কারাদণ্ড কি রকম হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ সশ্রম না বিনাশ্রম, ছ'মাস, এক বছর না যাবজ্জীবনের জন্যে, প্রত্যেক দেশের অপরাধ-আইন পুস্তকের বিবিধ ধারায় সে সব কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রথাটি অনেক দিন থেকেই চলে আসছে। জনসাধারণের সকলেই এটা এমন ভাবে মেনে নিয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কারুর মনে কোন রকম প্রশ্নই বড় একটা জাগে না, যদিও বা কখনও এ সম্বন্ধে কোন রকম আলোচনা হয় ত সে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে ছোট ছোট গণ্ডীর ভেতর। অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে কারাবাসের সময়ের সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোন্ কোন্ অপরাধে কারাদণ্ড অসমীচীন, কিম্বা আরও কোন্ কোন্ অপরাধে কারাদণ্ড হওয়া বিধেয়, এই জাতীয় আলোচনা মাঝে মাঝে হতে দেখা গেছে। কিন্তু কারাদণ্ড আদৌ হওয়া উচিত কিনা, কিম্বা যে উদ্দেশ্যে এই শাস্তি দেওয়া হয়, সে উদ্দেশ্য কারাবাসের ফলে কতখানি সাধিত হয়, কারাগারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কি রকম হওয়া প্রয়োজন এই

সমস্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা এ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই হয় নি। একথা জোর করেই বলা যায় যে, মনোবিদ্যার নব আবিষ্কৃত তথ্যগুলির বহুল প্রচারের ফলেই শাসনকর্তাদের, সমাজনেতাদের, বিচারকদের এবং আইন-ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এদিকে সম্প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এই সব সম্বন্ধে অনুসন্ধান, আলোচনা এবং প্রয়োজন মত প্রতিকারের চেষ্টার সূচনা দেখা যাচ্ছে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতিনীতি, আইন-কানুন ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নইলে সমাজে অমঙ্গল প্রবেশ করে, রাজ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, গৃহ অশান্তিতে ভরে ওঠে।

আমাদের দেশে কারাদণ্ডের প্রথা বহুকালের প্রথা। অনেকের ধারণা আছে প্রাচীন ভারতবর্ষে কারাগার ছিল না। সে ধারণা ঠিক নয়। মহাভারতে দেখা যায়, জরাসন্ধ অনেক রাজা-মহারাজাকে বন্দী করে কারাগারে রেখে দিয়েছিলেন। কংস রাজা দৈববাণীকে বিফল করবার অভিপ্রায়ে দৈবকীকে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তবে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে শুধু আটক রাখাটাই বোধ হয় তখন কারাগারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশে পুরাকালে কারাগারে যে ব্যবস্থা ছিল না তা নয়, তবে কারাদণ্ডের প্রচলন খুব কমই ছিল বলা যায়। ইংলণ্ডে প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই কারাদণ্ডের বিশেষ প্রচলন আরম্ভ হয়। জরিমানা আদায়ের একটা বিশেষ উপায় হিসাবেই কিন্তু প্রথম প্রথম এই দণ্ড দেওয়া হ'ত। সেই সময়ের

অন্যান্য দেশের আইন এবং শাস্তির ব্যবস্থা অনুসন্ধান করলে এই ধারণাই হয় যে, যদিও খুব প্রাচীন কালে অসভ্য জাতিদের ভিতরেও কারাদণ্ডের ধারণা একটা ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে অপরাধের শাস্তি হিসাবে এর বহুল প্রচলন মধ্যযুগ থেকেই আরম্ভ হয়। সেকালের ধর্মসম্প্রদায়ের কর্তারাও কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করতেন। মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার তাঁদের ছিল না বলেই তাঁরা এই দণ্ডের যথেচ্ছ ব্যবহার করতেন। কাউকে একেবারে নির্জন ঘরে একলা আবদ্ধ করে রাখা হ'ত, যাকে বলে 'সলিটারী কন্‌ফাইনমেণ্ট'—আবার কাউকে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হ'ত। ক্রমশ কয়েদীদের কাজে লাগানোর কথা মনে হয় এবং যে সব অপরাধী কার্যক্ষম, তাদের আটক না রেখে জোর করে কোন কাজে লাগানো হ'ত। স্ত্রীলোক, রোগী, বৃদ্ধ বা যারা অন্য কোন কারণে কাজ করতে অক্ষম তাদেরই শুধু আবদ্ধ রাখা হ'ত। এই সময় থেকেই একটা নূতন ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। লণ্ডনের একজন বিশপ, রিড্‌লে তাঁর নাম, তিনি একটা আন্দোলন আরম্ভ করেন যে, শহরের অশিক্ষিত বলিষ্ঠ ছেলেরা—যারা কোন কিছু করে না বরং মার-ধোর, গুণ্ডামি, ছোটখাট চুরি—ছিঁচকে চুরি আর কি, যৌন ব্যভিচার প্রভৃতি অপকর্ম করেই বেড়ায় তাদের দিনকতক আটক রেখে শোধরাবার ব্যবস্থা করা উচিত। এই আন্দোলনের ফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পার্লামেণ্টে এই মর্মে এক আইন পাশ হয় যে, প্রত্যেক

'কাউন্টি'তে একটা করে 'সংশোধনাগার' (House of Correction) স্থাপন করা হবে এবং খুঁজে পেতে ঐ ধরণের বদমাইস, ভবঘুরে, কুঁড়ে—এবং দুশ্চরিত্রাদের ধরে এনে সেইখানে আবদ্ধ করে রাখা হবে। সংশোধনাগার অনেক কাউন্টিতেই স্থাপিত হ'ল এবং কাজও বেশ চলতে লাগল। ক্রমশ অন্য ধরণের অপরাধীদেরও সংশোধনাগারে আটকে রাখা হতে লাগল। সাধারণ জেল আর সংশোধনাগারের ভিতর তফাৎ আর বেশী রইল না। দু'জায়গাতেই চাবুক এবং লোহার শৃঙ্খলের ব্যবস্থা ছিল। এই সংশোধনাগারের ভিত্তিতে যে চিন্তা এবং উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশের মনীষী এবং হৃদয়বান লোকেরা তার গভীরতা এবং কার্যকারিতা সহজেই উপলব্ধি করলেন। কাজেই সমস্ত ইউরোপেই তখন সংশোধনাগার নির্মিত হতে লাগল। জার্মেনীতে এই সংশোধনাগারগুলি বিশেষ কার্যকরী হয়ে উঠল। তবে ইউরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত সংশোধনাগার ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের অন্তর্গত ঘেণ্ট শহরে স্থাপিত হয়।

সংশোধনাগারের পর এল জেল-সংশোধনের চেষ্টা। এই সম্বন্ধে প্রথমেই নাম করতে হয় জন্ হাওয়ার্ডের। নিজে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রায় সমস্ত জেলই পরিদর্শন করে তিনি ১৭৭৭ সালে State prisons in England বলে যে বইখানি লিখেছিলেন তাতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তখনকার জেল সম্বন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, অল্পবয়স্ক পথভ্রষ্টদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

একেবারে বিনষ্ট করে দেওয়াই ম্যাজিষ্ট্রেটদের যদি অভিপ্রায় হয়, তা হলে এই সব জেলে আটক রাখার চেয়ে কার্যকরী উপায় তাঁরা উদ্ভাবন করতে পারবেন না। কারণ এমন কোন পাপাচার নেই যা এই সব জেলে হয় না।—তাঁর এই কঠোর মন্তব্যের পর জেল-সংশোধনের একটা সাড়া পড়ে গেল এবং চারিদিকে কতকগুলি কারা-সংস্কার সমিতি (Prison Reform Societies) স্থাপিত হতে লাগল। স্বীকার করতেই হবে, এই সব সমিতির চেষ্টায় জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন, অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এমন কি কিছুদিন পরে একজন ত দুঃখ করেই লিখলেন—হায় রে! জেল আর সে জেল নেই ; লোকে এখন জেলের ভয় আর করে না বরং অনেকে বাইরের কষ্টকর স্বাধীন জীবনের চেয়ে জেলের আরামের পবাধীন জীবনই বেশী পছন্দ করে। একথা তিনি বলেছিলেন এক শ' বছরেরও আগে ১৮২১ সালে। আজ ১৯৪৯ সাল। জেল বা কারাদণ্ড সম্বন্ধে আজকে আর কি কিছু বলবার নেই—সব কথাই কি বলা হয়ে গেছে—সব উন্নতিই কি করা শেষ হয়ে গেছে। তা মনে করা একেবারেই সমীচীন নয়। সমাজ গতিশীল। এক শ' বছরে সমাজের আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক আদর্শেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখনকার দিনে কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল, এখনও আছে কিনা সেটা ভাববার কথা। আর এখন যা উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য কতখানি সফল

হচ্ছে, তারও বিচার করা দরকার। ঠিক আগেকার মত জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, তা সে ব্যবস্থা যত ভালই হউক এখনকার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারছে কি না তা পরীক্ষা করা দরকার। যদি না পারে তা হলে আবার সংস্কারের কথা ভাবতে হবে। এখন এই সব বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করা যাক।

কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য কি? প্রধান উদ্দেশ্য আইনভঙ্গ যে করেছে, অপরাধ যে করেছে তাকে আটক রাখা। আটক রেখে কি লাভ হয়? আটক রাখার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে মোটামুটি তিনটি। প্রথম, তাকে আটকে রাখলে সে সমাজের অনিষ্টকর কাজ করতে অক্ষম হবে। তাতে সমাজের উপকার হবে। দ্বিতীয়, তার শাস্তি দেখে অন্য লোকে ঐ রকম অনিষ্টকর কাজ থেকে ভয় পেয়ে বিরত হবে এবং তৃতীয়, এই শাস্তি ভোগ করবার ফলে অপরাধীর মনের পরিবর্তন এবং ছাড়া পাবার পর অপরাধ করবার প্রবৃত্তি তার আর থাকবে না।

প্রথম যুক্তিটি সহজেই মেনে নেওয়া যায়। বাস্তবিক যে সমাজের বাইরে একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল সে আর সমাজের অনিষ্টকর কাজ কি করে করতে পারবে। কিন্তু এখানেও একটু ভাববার কথা আছে। এ রকম ঘটনা বেশী হয় ত ঘটে না কিন্তু তবুও কয়েদী জেলের গার্ডকে কিম্বা অন্য কয়েদীকে মার-ধোর করল, এমন কি খুন পর্যন্ত করল—এ ধরণের ব্যাপারও মাঝে

মাঝে হয়। তা ছাড়া পরস্পরের বিকৃত যৌনাচার অনেক সময়ই লক্ষিত হয়েছে। জেলের গার্ড যদি একটু সহায় হয় তা হলে আরও অনেক রকমের অপরাধ জেলের ভিতর বসে বসেও করা যায়। জেল থেকে পালানো যায়ই। একবার আমেরিকায় অনেক মেকি মুদ্রা বাজারে চলতে থাকে। পুলিসের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, ঐ মেকি মুদ্রা সেখানকার এক জেলের ভেতর কয়েকজন কয়েদী মিলে তৈরী করে এবং জেলের গার্ডের সাহায্যে বাইরে চালায়। সমাজ জেলের গার্ডের উপর অনেকখানি দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। গার্ড যদি সে দায়িত্ব বহন করবার উপযোগী না হয়, তা হলে অপরাধীকে আটক রাখা সত্ত্বেও সমাজ তার অপকর্মের হাত থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি না পেতেও পারে।

দ্বিতীয় যুক্তিটির সার্থকতা প্রথমটির চেয়ে ঢের কম একথা বলতেই হবে। একজন একটা কাজ করে জেলে গেল দেখে আর একজন সেই কাজ থেকে বিরত হবে তা ধরে নেওয়া যায় না। চুরির অপরাধে জেলে ত অনেকেই যাচ্ছে—তাতে চুরি বন্ধ হচ্ছে কি? কোন ফলই যে হয় না একথা অবশ্য বলছি না। কিন্তু যারা বিরত হয় তারা ঠিক আটক থাকবার ভয়েই বিরত হয় কিনা তা বলা যায় না। বিচার হবে, পাঁচ জনের সামনে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে—কারাবাসের হুকুম হয়েছে বলে সবাই জানবে—এই সব মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা

ভাব হয়, শুধু আটক থাকবার সম্ভাবনাটাই বিরতির কারণ নাও হতে পারে।

তৃতীয় যুক্তিটি সবচেয়ে দুর্বল। আটক থাকার ফলে অপরাধীর মনের পরিবর্তন হবে এবং বাইরে এসে সে আর অপরাধ করবে না—এটা একটা কল্পনামাত্র। বাস্তব ভিত্তি এর নেই। একটি রিফর্মেটরী থেকে ৫১০ জন পর পর ছাড়া পায়। পাঁচ ছয় বছর বাদে দেখা গেল তাদের ৩১৬ জন আবার নানা রকম অপরাধে ধরা পড়েছে। শিকাগোতে ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ সাল অবধি যে ৩০০ বালককে একটি বিশেষ স্কুলে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, ১৯৩৩ সালে দেখা গেল তাদের মধ্যে ১৮৭ জন জেল খাটছে, দুই জনের খুনের অপরাধে ফাঁসি হয়ে গেছে, সাতচল্লিশ জন নিরুদ্দেশ ইত্যাদি; কেবলমাত্র আঠার জন সৎপথে থেকে সহজ জীবন যাপন করছে। অপরাধ করার এবং অপরাধ থেকে বিরত হবার প্রবৃত্তি অনেকটা মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু শুধু আটক থাকায় অপরাধ করার প্রবৃত্তি কতটুকু কমে বা আদৌ কমে কিনা, তা নির্ণয় অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

অনেক কয়েদী কারাগার সম্বন্ধে তাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করে গেছে। একজন বলছে—উন্নতির সত্যিকারের আন্তরিক চেষ্টাকে কারাগার পদে পদে বাধা দেয় এবং উন্নতির সব পথই একেবারে বন্ধ করে দেয়। আর একজন বলছে, এগার বছর বয়সে আমাকে দুষ্টু ছেলেদের একটা স্কুলে

পাঠানো হয়। সেখান থেকে একজন বেশ ভাল পকেট-মার হয়ে আমি ফিরি। সতের বছর বয়সে আমায় রিফর্মেটরীতে পাঠানো হ'ল, সেখান থেকে একজন পাকা সিঁদেল চোর হয়ে বেরুলাম। তারপর জেলে গেলাম, সেখান থেকে চূড়ান্ত রকমের অপরাধী হয়ে বেরিয়ে এসেছি। সাধারণতঃ অপরাধীরা যে সব অপরাধ করে থাকে সে সবই আমি করেছি এবং অপরাধী হয়েই মরব এই আশঙ্কাই করি।

এই ধরণের অনেক বিবৃতি সংগৃহীত আছে। মনে হতে পারে এগুলি একতরফা। আটক থাকার ফলে ভাল হয়েছে এ রকম মতও হয়ত আছে। একেবারে নেই তা নয়। প্রথমতঃ তার সংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তন হয় কিনা মতের চেয়ে কাজের ভিতর দিয়েই তা বেশী প্রকাশ পায়। একবার যারা জেলে গেছে তারা কি রকম হয়েছে তা অনুসন্ধান করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ ফলই দেখা গেছে। জেল-কর্তৃপক্ষের অনেকের মতেই কয়েদীদের প্রতিকূল মতেরই অনুরূপ। একজন বলেছেন, "Imprisonment as it exists to-day, is worst crime than any of these committed by its victims." আর একজন লিখেছেন, "If absolutely innocent individuals were put under prison conditions they would tend to develop anti-social conceptions of conduct."

এই আলোচিত মতামত থেকে এইটেই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, কারাগারে মনের এবং চরিত্রের পরিবর্তন বিশেষ হয় না, সংশোধন কোন রকম ত হয়ই না বরং খারাপ হয়। কিন্তু আমরা সকলেই চাই যে, জেল থেকে অপরাধী ভাল হয়েই ফিরবে। ভাল হবে বলেই ত তাকে জেলে পাঠানো, ফিরে এসে যদি সে আবার অনিষ্টকর কাজই করতে থাকে তা হলে সমাজ-সংরক্ষণ কি করে হবে? এ পর্যন্ত মানসিক পরিবর্তনের কোন সুবিধা কারাগার যদি না করে দিয়ে থাকতে পারে তা হলে কারাগার-ব্যবস্থার কোথায় ত্রুটি গলদ আছে তা অনুসন্ধান করা আবশ্যক এবং তার সংস্কার প্রয়োজন এবং সংশোধন দরকার।

এই সমস্যাই এখন কারা-সংস্কারকদের গবেষণার বিষয়। দেখা যাক, তাঁরা কি ভাবে এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন।

প্রথমেই অনুধাবন করবার কথা হচ্ছে এই যে, কারাগার-ব্যবস্থাটা এমনই একটা ব্যবস্থা যে তার সঙ্গে উন্নতির পথের কতকগুলি প্রতিবন্ধক স্বতঃই জড়িয়ে থাকে। কতকগুলি বাহ্যিক—যেমন ছোট অস্বাস্থ্যকর ঘর, দুর্গন্ধ, পোকামাকড়, অলসতা প্রভৃতি। এগুলির পরিবর্তন সহজেই করা যায়। কিন্তু কতকগুলির ভিত্তি আরও গভীর, সহজে বদলানো যায় না।

অনেক সময় উপযুক্ত লোকের অভাবে জেলের কাজ সুচারুরূপে চালাবার ব্যবস্থা হয় না। আমরা আশা করছি

যে জেল থেকে অপরাধী সংশোধিত হয়ে ফিরবে, কিন্তু সেই সংশোধনের ভার কার ওপর দিচ্ছি সেটা বিবেচনা করা উচিত নয় কি? কারা-কর্তৃপক্ষের অপরাধীদের মনের কার্যাবলী তাদের মানসিক গতির ধারা প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে তাদের মনের পরিবর্তন কি তাঁরা করাতে সমর্থ হবেন? এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে উপযুক্ত লোক যাতে নিযুক্ত হয় সকলের তা দেখা উচিত। তারপর শুধু জ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারী হলেই হবে না। অর্থ, জিনিসপত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর কাজের যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ দিতে হবে। জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হলে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

জেলে কয়েদীদের নিয়ম মেনে চলতে হয়। এই নিয়মানুবর্তিতা একটা মস্ত ব্যাপার হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে এবং এই নিয়ে গার্ড এবং কয়েদীদের মধ্যে গোলমালের সৃষ্টি প্রায়ই হয়। কোন কয়েদী হয়ত গার্ডকে দেখে উঠে দাঁড়াল না বা সেলাম করল না, গার্ড মনে করলেন তাঁর মানের হানি হল, তিনি সাজা দিতে উদ্যত হলেন, লাভের মধ্যে মন-কষাকষি বেড়েই চলল। এই বাইরের জিনিস ছাড়াও মনোবিদ্যার দিক থেকে কয়েদীদের নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে আলোচনা করবার বিষয় আছে।

কয়েদীদের নিয়মানুবর্তিতা মানে তাদের 'দৈনিক জীবনের সমস্ত খুটিনাটি' নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা। কখন উঠবে, কখন বসবে, কখন খাবে, কি খাবে, কি করবে, কি করবে না সমস্তই ওপরওয়ালার হুকুম এবং নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত

হয়। দেখা গেছে, এর ফল সাধারণতঃ দু-রকমের হয়। কেউ কেউ কোন রকম প্রতিবাদ করে না। খুব সহজেই তারা তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। সব নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলাই তাদের অভ্যাস হয়ে পড়ে। গার্ড়দের কাজের তাতে খুব সুবিধা হয়, কিন্তু এই ধরণের অনেক কয়েদীই তাদের সমস্ত মানসিক শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে, কোনরকম কর্মপ্রেরণা বা উদ্যম তাদের আর জাগর থাকে না। তারা কেবল জাগরস্বপ্ন দেখে, কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। এই বাস্তব জগৎ থেকে পালিয়ে কল্পনার রাজত্বে আশ্রয় নেওয়া এবং এই বাস্তবতার থেকে দূরে সরে থাকার অভ্যাস মনের উন্নতির পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায়।

আর একদল কয়েদী কিছুতেই এই নিয়ম-কানুনের মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে পারে না, তারা সারাক্ষণই নিয়ম ভঙ্গ করছে এবং ফলে অনবরত শাস্তি ভোগ করেছে। এতে তাদের মনে অপরিসীম একটা বিদ্বেষভাব সর্বক্ষণই জেগে থাকে এবং সকলের ওপর একটা বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়।

সুতরাং নিয়ম মানুক আর নাই মানুক মনের দিকে দুয়েরই পরিণাম একই। সে পরিণাম হচ্ছে মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়া বা এক রকম পাগল হয়ে যাওয়া। মৌলিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কারাবাসের মেয়াদের ওপর এই বিকার অনেকখানি নির্ভর করে। জেলে আসবার সময় যাদের মন

স্বাভাবিকই ছিল এক মাস কারাবাসের পর তাদের মধ্যে যত জনের মানসিক বিকার হয়েছিল এক বছরের পর তার চল্লিশ গুণ লোক পাগল হয়েছিল।

এমন এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই ওঠে, তা হলে কি নিয়মানুবর্তিতার এই কঠোরতা মন্দীভূত করা বা নিয়মানুবর্তিতা একেবারেই তুলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। হ্যাঁ কি না বলে এর জবাব দেওয়া চলে না। হঠাৎ কোন একটা সিদ্ধান্তের বশীভূত হয়ে কিছু করে ফেলাও সমীচীন নয়। প্রথমে ভেবে দেখা উচিত নিয়মানুবর্তিতার খারাপ ফল কি কারণে হয়, তার পর ধীরে ধীরে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

নিয়মানুবর্তিতার খারাপ ফলের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, কয়েদীকে স্বাধীন চিন্তা করবার কোন রকম অবকাশ দেওয়া হয় না। জোর করে তাকে নিয়ম মানানো হয়। এর পেছনে এই তথ্য রয়েছে যে, নিয়ম মানা একবার তার অভ্যাস হয়ে গেলে জেলের বাইরে এসেও সে সামাজিক সব নিয়ম মেনে চলবে ; কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভুল, এর কোন ভিত্তিই নেই। নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস করতে হলে যে স্বাধীন চিন্তা বর্জন করতেই হবে তার কোন প্রমাণই নেই। যাঁরা স্বাধীন চিন্তা করেন তাঁরা যে নিয়মানুবর্তী হতে পারেন না তা ত বলা যায় না। সুতরাং স্বাধীন চিন্তা করবার সুযোগ দিলে কয়েদীরা নিয়মানুবর্তী হবে না এটা ধরে নেওয়া আজকাল আর চলে না। কয়েদীদের প্রতি জেল-কর্মচারীদের মনোভাব এবং ব্যবহারের ওপর কয়েদীদের মানসিক

পরিবর্তন ও উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। তাঁরা যদি শুধু কর্তৃত্ব করব এই ভাবটা মন থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তাঁরা যদি একটু দূরদৃষ্টি ও সহানুভূতিসম্পন্ন হন তা হলে কয়েদীদের সংশোধনের কাজ অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। একটা শক্ত প্রশ্ন কিন্তু এখানে থেকে যায়। কারাকর্তৃপক্ষের প্রধান কাজই হচ্ছে কয়েদীদের আটকে রাখা এবং অনেক কয়েদীর প্রধান চেষ্টাই হচ্ছে জেল থেকে পালানো। সুতরাং এই দুই দলের মধ্যে মূলগত একটা বিদ্বেষের ভাব থাকেই; কিন্তু এটা ভবিষ্যতে লাঘব করা যেতে পারবে বলে বিশ্বাস হয়।

সংশোধনের একটা মস্ত বড় অন্তরায় হচ্ছে কয়েদীদের পরস্পরের ভিতর যে এক-গোষ্ঠী-বোধ (group feeling বা Espirit de corps) সৃষ্টি হয় তাই। কয়েদীদের ভাব, চিন্তা প্রভৃতি অন্য কয়েদীদের মতামতের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। যে খুব বড় রকমের অসামাজিক কাজের ফলে জেলে এসেছে অন্য কয়েদীরা তাকে সম্মানের চোখে দেখে। বাইরে যেমন ভাল কাজ করলে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করা যায়, জেলের ভিতর তেমনই যে যত বেশী খারাপ কাজ করে সে ততই অন্য কয়েদীদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং যে ভাল কাজ করে সে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অপরাধের উপর ভিত্তি করেই কয়েদীদের পরস্পরের ভিতর মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এর ফলে যে মনোভাব গড়ে ওঠে সেটা অতিক্রম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

এই সবের প্রতিকারকল্পে এখন একটা উপায়ের পরীক্ষা চলছে বলা যায়। সেটা হচ্ছে কয়েদীদের স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করা। অস্‌বোর্ণ এই ব্যবস্থা চালাবার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। আমেরিকার বিখ্যাত সিং-সিং জেলে তিনি এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কয়েদীরা নিজেরাই পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করবে, কে কখন কি রকম ভাবে কোন্ কাজ করবে। তারা শুধু এক একটা নম্বর, যন্ত্রবিশেষ, তাদের কোন দায়িত্ব নেই এ ভাবটা চলে গিয়ে যখনই কয়েদীরা মনে করতে আরম্ভ করবে যে তারা প্রত্যেকেই, অন্য সকলের—তাদের সঙ্গীদের—ভাল-মন্দের জন্য খানিকটা দায়ী তখনই তাদের মনের পরিবর্তন হতে আরম্ভ হবে। এই ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে কাজে পরিণত করা যে খুব সহজ তা নয় কিন্তু অনেক জেলে ইতিমধ্যেই এই প্রথা চলছে এবং তাতে ভাল ফলই পাওয়া গেছে। আমাদের দেশেও এই পরীক্ষা চালানো যায় না কি ?

পরিশেষে একটা কথা বলি। জেলগুলি শুধু আটক রাখবার জায়গা না হয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র হওয়া উচিত। তা হলে অনুসন্ধানের সুযোগ যথেষ্ট বেড়ে যাবে। সমাজের পক্ষে সে ব্যবস্থা কল্যাণকরই হবে।

অপরাধ কোথায় ?

অপরাধতত্ত্ব (Criminology) সম্বন্ধে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেক দেশেই কে অপরাধী, কে নয় তা বিচার করবার বহু আইন প্রবর্তিত আছে এবং অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সব আইনগুলিই বা সব অররাধবিধিই যে নীতি বা মনস্তত্ত্বের হিসাবে সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত তা অবশ্য স্বীকার করা যায় না। তবে যতদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিশ্লেষণের ফলে সেগুলির পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেগুলি মেনে নিতেই হবে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কিছুদিন আগেও অপরাধ সম্বন্ধে আইনগুলি (Criminal Laws) অভ্রান্ত এবং চিরন্তন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল, সে ধারণার ভিত্তি সম্প্রতি কিছু শিথিল হয়েছে। গত শতাব্দীতে কারাগারের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ, শাস্তির বিধি, প্রণালী প্রভৃতি সম্পর্কে যে সংস্কারমূলক আলোড়ন আরম্ভ হয়েছিল তা আজ মনোজগতের নূতন আবিষ্কারগুলির সহায়তা লাভ করে প্রবলতর হয়ে উঠেছে এবং তার গতির বেগও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভরসা করা যায় শীঘ্রই সমস্ত দেশেই কতকগুলি প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে।

যে ধরণের অপরাধের কথা সামান্যভাবে এখানে বলবার চেষ্টা করবো সে অপরাধের অপরাধী অল্পবিস্তর সকলেই। আপনি, আমি, খুড়োমশাই, ঘোষসাহেব, পুলিনদা, রাজেন্দ্র, সুধীর, দ্বিজেন প্রভৃতি কেউ বাদ যাবেন না। তবে লুম্বিনি কানন ও রাঁচীর হাসপাতালের শয্যার অধিকারীরা সম্ভবতঃ একটু বেশী অপরাধী। আপনাকে অপরাধী বলায় আপনি আপত্তি করতে পারেন কারণ আপনার কোন অপরাধ সম্বন্ধে আপনি সচেতন নন। আমি অপরাধী অথচ আমার অপরাধ কি আমি কিছুই জানি না, এ কি করে সম্ভব হতে পারে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এর উত্তরে প্রথমে সেই পুরাণো গল্পটি, বাল্যকালে পাঠ্যপুস্তকে যেটি পড়েছিলেন সেটি, আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। পেছন দিককার ঝুড়িতে যে জিনিষগুলি ছিল, ভারী সেগুলি দেখতে পায়নি বলে সেগুলি যে ছিল না তা তো নয়। সেইরকম আপনার মনের মধ্যেও অনেক বস্তু আছে, অনেক ঘটনা ঘটে যাদের সম্বন্ধে আপনি সচেতন নন। কিন্তু তাই বলে সেগুলি নেই বা সে ঘটনাগুলি ঘটে না এ যুক্তি ন্যায়সঙ্গত নয়। দ্বিতীয়ত আপনার অপরাধ সম্বন্ধে আপনি আদৌ কিছু জানেন না, এ কথা কি ঠিক? অনেক সময় আপনার মনের আনাচে কানাচে কাজটি ভাল করিনি—এই রকম একটা ভাব অর্থাৎ একটি অপরাধীভাব ভেসে আসে না কি? আপনি নানা রকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে সে ভাবটি চাপা দেন। শেষ পর্যন্ত কাজটির কথা হয়তো ভুলে যান, শুধু একটি অস্বস্তি বা উদ্বেগ বা বিদ্বেষের ভাব

কোন একটি লোক, বস্তু বা কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। প্রত্যেক লোকের প্রতি আপনার মনোভাব, ব্যবহার বিভিন্ন রকমের হয়। এই ব্যবহার, মনোভাবের ধারা হঠাৎ একদিন নির্ণীত হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অপর লোকটির মানসিক গুণাবলী এবং তা প্রকাশের বৈশিষ্ট্য এবং আপনারও বিশিষ্ট মানসিক বৃত্তিনিচয় এবং তাদের প্রকাশভঙ্গী; এই সকলের ঘাত প্রতিঘাতে এবং সমন্বয়ে ক্রমশ আপনার সামাজিক ব্যবহারের একটি বিশিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে কোন একটাকে আপনার ব্যবহারের সম্পূর্ণ কারণ বলে বর্ণনা করা যায় না সুতরাং শাশুড়ী কেন একটি পুত্রবধূর "সাতখুন মাপ" করেন এবং আর একটির ওপর "পান থেকে চূণ খস্‌লেই খড়্গ (অথবা ঝাঁটা)-হস্তা হন, তার কারণ হিসাবে কেউ যদি শুধু পুত্রবধূদের কর্মকুশলতা প্রভৃতির পার্থক্যের কথাই বলেন তা হলে তাঁর যুক্তি একদর্শিতা দোষে দুষ্ট হবে। শাশুড়ীর দিকটাও দেখা প্রয়োজন। একটু ভেবে দেখুন না, হরিচরণের ওপর আপনার ততটা বিদ্বেষভাব পোষণের কারণ কি শুধু হরিচরণের আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার, না আপনার দিকেও কিছু আছে?

আপনি অনেক ভেবেও আপনার ব্যবহারে কোন ত্রুটির সন্ধান পেলেন না। সুতরাং আপনার কাছে আপনার সিদ্ধান্ত অটল রইল যে হরিচরণের ব্যবহারই আপনার বিদ্বেষের একমাত্র কারণ। আমিও মেনে নিলুম যে আপনি যথাসম্ভব নির্মমভাবে আপনার কার্যাবলী বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাতে

দোষের কোন পরিচয় পান নি। পাঁচজনে কিন্তু বলেন হরিচরণকে যতটা খারাপ লোক আপনি বিবেচনা করেন আসলে তিনি ততটা খারাপ লোক নন এবং আপনার সঙ্গে এমন কিছু দুর্ব্যবহার তিনি কখন করেন নি। তাঁদের মতে আপনার এ বিদ্বেষ অহেতুক। একে মনোজগতের একটি রহস্যময় ব্যাপার বলেই তাঁরা মনে করেন। ব্যাপারটি রহস্যময় সন্দেহ নেই কিন্তু মনোবিদ্যায় এই রহস্যের সমাধানের পথ দেখিয়ে দিয়েছে এবং এই সূত্রেই নির্জ্ঞান অপরাধের (Unconscious guilt) কথা বলেছে।

আমাদের বাইরে প্রকাশিত বহু চিন্তাধারা, কার্য, প্রক্ষোভ (emotions), আচার, ব্যবহার প্রভৃতির পেছনে কতকগুলি প্রেরণা (drives, motives) থাকে, যাদের অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা কখনও পাই না। সেগুলি মনের নির্জ্ঞান (unconscious) স্তরে আছে বলে মনোবিদ্‌রা বর্ণনা করেন। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও কোন বস্তু যে থাকতে পারে এ তত্ত্বটি এই বিংশ শতাব্দীতে ঘটা করে প্রমাণ করতে যাবার কোন দরকার নাই। আপনার বন্ধুর বুদ্ধির অস্তিত্ব (বা অভাব) সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহই নেই, যদিও ঐ বুদ্ধির প্রত্যক্ষ পরিচয় আপনার নেই। অর্থাৎ আপনি সে বুদ্ধি কখনও দেখেন নি, শোনেন নি, স্পর্শ, আঘ্রাণ বা আস্বাদ কিছুই করেন নি। বন্ধুর কার্যাবলী দেখে তাদের কারণস্বরূপ বন্ধুর বুদ্ধির অস্তিত্ব অনুমান করেছেন, নয় কি ?

সমাজ যে সব কাজ অপরাধ বলে বর্ণনা করে, সেই সব কাজ করবার বহু প্রেরণা অর্থাৎ অপরাধ করবার বহু ইচ্ছা আমাদের মনের নিজ্ঞান স্তরে থাকে। বাস্তবিক তাদের সোজাসুজি বিকাশের পথে বাধা দিয়েই সভ্যতা ও সমাজ গড়ে উঠেছে। মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) বিজ্ঞান-সম্মতভাবে এদের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করবার অনেক আগে এদের ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকের মনে কিছু কিছু ধারণা যে ছিল বিভিন্ন ধর্মের বিবিধ শাস্ত্রের বিধি নিষেধ তার প্রমাণ। পিতামাতাকে সম্মান করিও (Honour thy parents), পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইও না (Thou shall not covet thy neighbour's wife) প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োজন হত না যদি পিতামাতাকে শ্রদ্ধা না করবার, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবার ইচ্ছা মানুষের মনে না থাকত। জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের যে একটি বাস্তব যোগ সম্পর্ক আছে, বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) তা দেখিয়ে দিয়েছে। সুতরাং অনেক জান্তব প্রবৃত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ পেয়েছে। নিষ্ঠুরতা, নিকট আত্মীয়দের সহিত সঙ্গম, এমন কি মাতৃগমন পর্যন্ত, পরস্পরকে আক্রমণ, যুদ্ধ ইত্যাদি প্রবৃত্তি মানুষের মনে স্থান পেয়েছে। নবজাত শিশুর এই সমস্ত প্রবৃত্তি শিক্ষার দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রণ করি। সহজাত-প্রবৃত্তির প্রবল আকর্ষণ ত্যাগ করে সভ্যতার নতুন নিয়ম মেনে নেবার আগে শিশুকে অনেক দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, অনেক স্তর অতিক্রম করতে হয়। সর্বাঙ্গ-সুন্দরভাবে এই

শিক্ষাদান কাজ সমাধান করা সুকঠিন ব্যাপার, কারণ প্রবৃত্তিগুলি সহজে অবদমিত হতে চায় না। সুযোগ পেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করে। নিষ্ঠুরতাকে অপরাধ বলে বর্ণনা করি। হাতাহাতি, মারামারি, কাটাকাটি করে বেড়ান সমাজের অনুমোদিত কাজ নয়। কিন্তু ঐ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে আমরা অতিক্রম করেছি কি? কোন গুরুস্থানীয় ব্যক্তিকে (যেমন অধ্যাপক মহাশয়কে) আক্রমণ করে কোন ঠাট্টা বিদ্রূপ আপনি কি অসীম আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন একবার মনে করুন না। এ আনন্দের মূল কোথায়? আক্রমণ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা এবং গুরুজনদের না মানার আদিম ইচ্ছার পরিতৃপ্তিই। এই আনন্দের মূল উৎস। হরিচরণের প্রতি বিদ্বেষ হয় ত এই অবদমিত নিষ্ঠুরতারই একটি বহিঃপ্রকাশ। তবে এ বহিঃপ্রকাশ হরিচরণকে আশ্রয় করে কেন হল, প্রাণতোষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ কেন হয় না তা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন এবং তার উত্তর অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

মনের নির্জ্ঞান স্তরে অপরাধ করবার ইচ্ছা যেমন প্রবল, অপরাধ-ইচ্ছার জন্য নিজেকে শাস্তি দেবার কৌশলও তেমনি নানা প্রকার। অনেক আত্মহত্যার এই দিক দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। আত্মহত্যাকারীদের জীবনের ঘটনাবলীর এবং মানসিক প্রতিক্রিয়ার সন্ধান যদি যথেষ্ট পরিমাণ কখনো পাওয়া যায় তা হলে একথা বোধ হয় সপ্রমাণ হবে যে অপরাধ ইচ্ছার জন্য নিজেকে চরম শাস্তি দেবার চেষ্টাতেই অনেকে আত্মহত্যা করে। তারপর অনেক সময় দেখা যায় একজন পাকা

অপরাধী (Criminal) নিখুঁতভাবে সমস্ত অপরাধ-চিহ্ন মুছে দিলেও কোথায় এমন একটি চিহ্ন রেখে যায় যাতে সে সহজে ধরা পড়ে। সকল বিষয়ে অশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবার বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি যার আছে, সে একটি সামান্য বিষয়ে এমন ভুল করে কেন? করে, কারণ ধরা পড়তে এবং শাস্তি ভোগ করিতে সে চায়। পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে যারা ধরা পড়ে ও শাস্তিভোগ করে (Recidivists) তাদের সম্বন্ধে এই তত্ত্বটিই সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। অনেক সময় নিজের অপরাধ-ইচ্ছা অন্যের উপর অভিক্ষেপ (project) করি এবং তাকে শাস্তি দিয়ে নিজের শাস্তির প্রয়োজনীয়তা মিটাই। সাদা স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানির অপরাধে কালো (Negro) -দের lynch করবার অত উত্তেজনার মূলে এইরূপ একটি ব্যাপার আছে। অসম্ভব বলে মনে হলেও একথা ঠিক যে অনেক ছোট ছেলে দুষ্টামি করে শুধু শাস্তি পাবার জন্যই।

নানা প্রকার মানসিক রোগের মূলে অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে এই অপরাধী মনোভাব একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। ব্যাপকভাবে ধরলে রোগভোগই ত শাস্তিভোগ। বিশ্লেষণ করে দেখলে অনেক রোগলক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্যই নিজেকে নিজে শাস্তি দেওয়া। বিষাদবায়ু (Melancholia) রোগে এই মনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য বায়ু-রোগেও, যেখানে রোগী নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করে, অপরাধী মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা অপরাধী (Criminal) বা মানসিক রোগগ্রস্ত নন—সহজ সাধারণ মানুষ,

তাঁদের কার্যাবলী যে এই ভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একথা মনে করলে ভুল হবে। সব ব্যাপারেই অধিক মাত্রায় উদ্বেগ, অস্থিরতা, অনবরত কথা বলে যাওয়া, ক্ষণকালের জন্যও নিঃসঙ্গ থাকার অপারকতা প্রভৃতির সঙ্গে এই মনোভাবের যোগ সহজেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু অনেক সময় বিচিত্র ধরণের ছদ্মরূপের ভেতর দিয়ে অপরাধ ইচ্ছা বা শাস্তি পাবার প্রয়োজনীয়তা আত্মপ্রকাশ করে তখন হঠাৎ তাদের স্বরূপ ধরা যায় না। এই ছদ্মরূপ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান এখনও আমাদের অর্জন করতে হবে। পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি যেমন জড়জগতের অনেক রহস্য উদঘাটন করবার সহায়তা করেছে, আশা করা যায় মনোবিদ্যার ক্রমপরিণতি মনের এখনও অনেক এরকম অজ্ঞাত ব্যাপারের ওপর ক্রমশ আলোকপাত করবে এবং এই নবলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপনের পথ আরও সুগম এবং অধিকতর মনোরম করতে সমর্থ হব।

'শেয়ার' ব্যবসায়ী

বৈচিত্র্য যে এই বিশ্বজগতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য একথা মেনে নিতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করবার কারও দরকার হয় না। জীবনের একটি দিনের অভিজ্ঞতার দিকে একটু মনোযোগ দিলেই কথাটির সত্যতা উপলব্ধি হয়। আকাশে কত রংয়ের খেলাই না আমরা দেখি, বাতাসে কত সুরের ঝঙ্কারই না শুনি! কত বিচিত্র রূপ রসের বিভিন্ন গন্ধ ও স্পর্শের, বিবিধ শব্দলহরীর মাধুর্য ও মহিমার কথা যুগের পর যুগ কবিরা গেয়েছেন, বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। সে বর্ণনার, সে ব্যাখ্যার শেষ আজও হয়নি। জীবজগতেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত কত বিভিন্ন গঠনের, বিভিন্ন প্রকৃতির জীব জগতে বিচরণ করে কে তার সংখ্যা সঠিক নির্ণয় করতে পারে। আবার জড় ও প্রাণীজগতের মত মনোজগতেও বৈষম্যের বিরলতা নেই। ঠিক একই ধরণের মানসিক-গঠন সম্পন্ন দুইটি ব্যক্তি কোথাও মেলে না। বুদ্ধি বা প্রক্ষোভ (Emotion), কর্মতৎপরতা প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তি এবং দয়া-দাক্ষিণ্য, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি গুণাগুণ প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু আছে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত মিলে

অবশেষে যে ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হয় তা প্রত্যেকেরই বিভিন্ন। তাই আমরা দেখি কেহ স্বভাবতই শান্ত ধীর, কেহ সর্বদাই চঞ্চল-অস্থির, কেহ বা অভ্যাসের দাস, আবার অনভ্যাসই কারও অভ্যাস। কেহ প্রত্যেক পয়সাটি হিসাব করে খরচ করেন, কেহ অতিমাত্রায় বেহিসাবী অপব্যয়ী, কেহ স্বল্পভাষী প্রত্যেক কথাই যেন ওজন করে বলেন, আবার কেহ নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে খুব ভালবাসেন তাই অনবরত কথাস্রোতও চালিয়ে যান। একটু চিন্তা করলেই আরও অনেক প্রকৃতির মানুষের কথা আপনাদের মনে আসবে। এই বিভিন্নতা শুধু পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, যুক্তপরিবারে যাঁরা বাস করেন—বাড়ীর গৃহিণীদের বধূদের কাজকর্মের ধারা, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করলেই বহুপ্রকার বৈলক্ষণ্যের সন্ধান তাঁরা পাবেন।

এই বিভিন্ন ধরণের মনোভাবসম্পন্ন লোকেদের ভেতর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের অস্বাভাবিক বলা নিশ্চয়ই যায় না, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে, তাঁদের কার্যকলাপ স্বাভাবিক লোকের মতও ঠিক নয়। তাঁরা যেন নিশ্চিতের চেয়ে 'অনিশ্চিতে'র আকর্ষণটাই বেশীমাত্রায় অনুভব করেন, এবং উপভোগও করেন। তাই অবশ্যম্ভাবী লাভের পথ ছেড়ে অনিশ্চিত হয় লাভ না হয় ক্ষতির পথে চলতে তাঁরা সব সময়েই বেশী পছন্দ করেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা সহজে বুঝা যাবে। ধরুন, কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যদি দৈবানুগ্রহে

এক হাজার টাকা অপ্রত্যাশিতভাবে পান তাহলে স্বতই তাঁর চেষ্টা হবে টাকাটা এমনভাবে কোথাও গচ্ছিত রাখতে যাতে সেটা নিরাপদে থাকে আর তিনি প্রতি বৎসর বা প্রতি ছ'মাস অন্তর ডিভিডেণ্ড বা স্থদ হিসাবে নিয়মিত কিছু পেতে পারেন। কিন্তু যে শ্রেণীর লোকের কথা আমি বলছি তাঁদের কেউ যদি ঐ টাকা পান তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ সোজা ফাটকা বাজারে অথবা শেয়ার মার্কেট ষ্টক এক্সচেঞ্জে গিয়ে কেনাবেচা আরম্ভ করে দেবেন। নিশ্চিত লাভের কথা, গৃহে অর্থের অসচ্ছলতার কথা বা অন্য কোন কথাই তাঁর মনে উদয় হবে না। বন্ধু-বান্ধবের সুপরামর্শ, আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। হয়ত ঐ কেনাবেচায় তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন। আবার সমস্ত টাকাটা সম্পূর্ণ লোকসান করে হয়ত বা আরও কিছু দেনা করেও তিনি ফিরতে পারেন। লোকসান হল বা ধার করতে হল বলে তিনি যে ঐ কাজ থেকে ভবিষ্যতে বিরত হবেন তা মনে করবেন না। আবার হাজার টাকা পেলে ঐ পথেই তিনি যাবেন কারণ ঐ পথই তাঁর একমাত্র পথ, অন্য পথের কোন আকর্ষণ তাঁর নেই। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন কোন্ প্রকৃতির লোকের কথা আমরা বলছি। এ ধরণের লোক নিশ্চয়ই আপনাদের অপরিচিত নন। আপনাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ধরে নেওয়া যায় একাধিক ব্যক্তি এই প্রকৃতির আছেন। কারণ এঁদের সংখ্যা

খুব কম নয়। এঁরা ব্যবসায় কর্মে অন্যার্য ঝুঁকি নেন ও হঠকারিতার সঙ্গে কাজ করেন। এই "অনিশ্চিতের পিয়াসীদের" ইংরাজী ভাষায় বলে, the speculators.

অভিধানে 'speculate' শব্দটির যে দুটি অর্থ দেওয়া আছে সে দু'টিতেই এই অনিশ্চিতের ইঙ্গিত পাই। কোন একটি কার্যের কারণ কি, বা কোন কারণের কার্য কি হতে পারে, নিশ্চিতভাবে জানা না থাকায় সম্ভব কারণ ও কার্যসমূহ সম্বন্ধে কল্পনা করার নাম 'speculate' করা আর ব্যবসায় ক্ষেত্রে অনিশ্চিত অধিক লাভে বিক্রয় করবার আশায় দ্রব্যাদি ক্রয় করা বা ধরে রাখাকেও speculate করা বলে, যিনি এরূপ কল্পনা বা ঐরূপ কাজ করেন তিনি speculator—-এখন কথাটির অর্থ এবং ব্যঞ্জনী একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

অনিশ্চিত সম্বন্ধে কল্পনা এবং সেই কল্পনা নিদিষ্ট পথে কাজে অগ্রসর হওয়া এই অর্থে যদি speculate কথাটি নেওয়া যায় তাহলে বলতেই হয় যে মানুষমাত্রই speculator কারণ এই পৃথিবীতে সর্বজ্ঞ কে আছেন? সমস্ত কারণের কার্য এবং কার্যের কারণ জ্ঞাত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কিছু পরিমাণ অজ্ঞাত, অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করে সকলকেই চলতে হয়। ভবিষ্যতে ফললাভের আশায় যে কোন কাজই আমরা করি সে সবই speculation-প্রসূত। কারণ ভবিষ্যত যে অতীতের মতই হবে এত অনাগত অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে একটি কল্পনা মাত্র। আমাদের

দৈনন্দিন ছোটবড় অভ্যস্ত অনভ্যস্ত সমস্ত কাজের মূলে এই speculation বিদ্যমান আছে। আজ পর্যন্ত যা ঘটে এসেছে কালও তা ঘটবে এ বিশ্বাস যদি না রাখি তা হলে আমরা একপদও এগোতে পারি না। কালও সূর্য উঠবে, আহারে ক্ষুন্নিবৃত্তি, পানীয়ে তৃষ্ণার অবসান হবে, এ সব আমরা ধরেই নি, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আমাদের মনে জাগেনা। সুতরাং আমরা অনবরতই speculation করছি।

আপনারা হয়ত বলবেন কথাটি ঠিক নয়। কল্পনা আর বৈজ্ঞানিক সত্য এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। কাল সূর্যোদয় হবে, পানীয় তৃষ্ণা নিবারণ হবে, এ গুলো কল্পনা নয়—বৈজ্ঞানিক সত্য। সুতরাং ঐ গুলির উপর ভিত্তি করে কাজে এগোনো speculate করা নয়। আমরা উপস্থিত প্রশ্ন করব না বৈজ্ঞানিক সত্য কাকে বলে। শুধু এখন যে principle of indeterminism সম্বন্ধে খুব আলোচনা বৈজ্ঞানিক মহলে চলছে তার কথা আপনাদের একবার স্মরণ করতে বলব। এবিষয়ে অবান্তর আলোচনা করবার এখানে আমাদের দরকারও নেই, কারণ আমরাও স্বীকার করি যে মানুষ মাত্রই স্পেকুলেটর (speculator) নয়। তা হলে speculator বলতে একটি বিশেষ কোন শ্রেণীর লোক বোঝাত না।

অনিশ্চিত সম্বন্ধে কল্পনা মাত্রকেই speculation বলব না। কল্পনাটির বাস্তব হবার সম্ভাবনা কত পরিমাণ আছে তার বিচার করে তবে নির্ণয় করব কল্পনাটি speculation

মাত্র—না যুক্তিযুক্ত চিন্তা বলতে মনোবিদরা যা বোঝেন তাই। সম্ভাবনার পরিমাণ নির্ণয় করবার পদ্ধতি অঙ্কশাস্ত্রের ব্যাপার, কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটবার বা না ঘটবার সম্ভাবনা কতটুকু সম্ভাব্য গণিতের (statistics) বিবিধ সূত্র অনুসারে অঙ্ক কষে বার করা যায়। যা হোক, আমরা সকলেই অঙ্কশাস্ত্র-বিদ্ নই কিন্তু ভবিষ্যত সম্বন্ধে কল্পনা সকলেই করে থাকি এবং সেই কল্পনা অনুযায়ী কাজও করে যাই। সম্ভব অসম্ভবের একটা মানদণ্ড নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা ঠিক করে নেই। শতকরা পঞ্চাশবার—যে ঘটনা পূর্বে কোন একটি অবস্থায় ঘটেছে ভবিষ্যতে সেই অবস্থায় সেই ঘটনা ঘটবে কিনা সঠিক বলা যায় না, ঘটবার বা না ঘটবার সম্ভাবনা সমান সমান, কিন্তু যে ঘটনা শতকরা ৬০ বার ঘটেছে ভবিষ্যতে না ঘটবার অপেক্ষা তা ঘটবার সম্ভাবনাই খুব বেশী। সেই রকম শতকরা যত বেশীবার পূর্বে কোন ঘটনা ঘটে ভবিষ্যতে তা ঘটবার সম্ভাবনা ততই বেশী হয়। সূর্য এ যাবৎ প্রত্যহই উঠেছে, সুতরাং কালও তার উঠবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই খুব বেশী সম্ভাবনাকেই আমরা নিশ্চিত বলে ধরে নিই। বৈজ্ঞানিক সত্য এই বেশী সম্ভাবনাই প্রকাশ করে। কারণ পুরোপুরি নিশ্চিত জ্ঞানলাভ, নিরপেক্ষ নিরঙ্কুশ সত্যের উপলব্ধি মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

আমাদের বক্তব্য এই যে পূর্বোক্ত হিসাব অনুসারে যে ঘটনা না ঘটবার সম্ভাবনাই বেশী সেই ঘটনা ঘটবে অথবা যা ঘটবার সম্ভাবনা বেশী তা ঘটবেনা—এরূপ আশা করে যিনি

কাজে, বিশেষ করে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন তিনিই স্পেকুলেটর। স্পেকুলেটরদের সাক্ষাৎ তাই শেয়ার মার্কেট এবং তদনুরূপ স্থানেই বেশী পাওয়া যায়। স্পেকুলেটরদের নিজেদের যে কোন অঙ্কের হিসাব থাকেনা তা নয় তবে তাদের হিসাব সাধারণ লোকের সহজ হিসাব থেকে তফাৎ হয়ে যায়। সাধারণে যা বিশ্বাস করে না তাঁরা তা করেন। বিশ্বাসের এই বিকৃতি কেন ঘটে ?

প্রথমেই বলা যায় তাঁদের প্রবল ইচ্ছাই অঘটন ঘটবে এই বিশ্বাসের মূল। Their wish is father to their thought. কিসের এই প্রবল ইচ্ছা ? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই ইচ্ছা অধিক অর্থ লাভের ইচ্ছা, কিন্তু অধিক অর্থলাভ ত অন্য উপায়েও হতে পারে। অর্থলোভই যদি স্পেকুলে-টরদের ব্যবসায়ের একমাত্র কারণ হয় তা হলে লোকসান হলে তাঁরা বিরত হননা কেন ? বিরত হতে হয়ত কখন কখনও বাধ্য হন কিন্তু তা বাইরের কোন কারণে, হয়ত উপস্থিত হাতে টাকা নাই বলে, কিন্তু মন থেকে তাঁদের সে ভাব যায় না। উপরন্তু প্রভূত অর্থ অন্যভাবে পেলেও তাঁরা নিবৃত্ত হন না। তাঁদের ব্যবহারে আরও দেখা যায় যে প্রথমে তাঁরা নিজেরা কিছু অর্থ ব্যয় করতে চান এবং বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পেতে চান। মনোবিদ্যার দিক থেকে দেখলে কিন্তু অর্থলাভটাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলা যায় না, কারণ অর্থনাশও যে হতে পারে এবং হয়ও তা তাঁরা বিলক্ষণ বোঝেন। তাহলে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, এই পাওয়া না পাওয়ার

অনিশ্চিয়তা হেতু আশা উদ্বেগ মিশ্রিত মনের যে একটি চাঞ্চল্যকর উত্তেজনাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থাটাই তাঁদের কাম্য। তাঁরা নিজেরা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না এবং আপনারাও হয়ত স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করছেন। মনে করছেন ইচ্ছা করে কে আবার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করতে চায়? এখানে মনোজগতের একটি তথ্যের কথা আপনাদের স্মরণ করতে অনুরোধ করি। আমাদের সব কাজই আমাদের জ্ঞাত ইচ্ছানুসারে হয় না, অনেক কাজের উৎসই নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছা (Unconscious wish)। নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছাই স্পেকুলেটরদের ঐ অবস্থায় আসতে বাধ্য করে। মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) বলে স্পেকুলেটরদের নিকট অর্থ শুধু অর্থ নয় অন্য জিনিসের প্রতীক, যেমন কৃপণদেরও। মৃত্যুকাল পর্যন্ত কৃপণতা করে এক ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করেই গেল, কোনদিন অর্থের ব্যবহার দ্বারা সুখভোগ সে করলে না। তার এই সঞ্চয়ের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না যদি না অর্থকে তার নির্জ্ঞানস্থিত কোন জিনিসের প্রতীক হিসাবে দেখি। স্পেকুলেটদেরও তদ্রূপ। অর্থ ব্যয় করার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া প্রভৃতি স্পেকুলেশন সংক্রান্ত সব কাজই নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে হলে তাই নির্জ্ঞানস্তরে পৌছান প্রয়োজন হয়।

নির্জ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে স্পেকুলেটরের অর্থ পাবার ইচ্ছা যেমন আছে, অর্থ নষ্ট করবার ইচ্ছাও

তেমনি আছে। এজন্যই তিনি এমন কাজ বেছে নেন যাতে অর্থনাশের সম্ভাবনাই অধিক অথচ যাতে মনকে প্রবোধ দিতে পারা যায় যে এই কাজে অধিক অর্থ লাভ হবে। ঝুঁকিযুক্ত কারবারে এই অর্থলাভ এবং অর্থ নষ্ট করা উভয় ইচ্ছাই তৃপ্ত হয়। স্পেকুলেটর যেন বাধ্য হয়েই তাই ক্ষতিকর কাজ নামেন।

গভীর মনোবিশ্লেষণে দেখা যায় যে অর্থলাভ ও অর্থ-নাশের ইচ্ছাদ্বয়ের প্রকৃত স্বরূপ যথাক্রমে অর্থ পাওঁয়া বা আদায় করা এবং অর্থ দেওয়া বা ঠকা। মনোবিদ্ দেখেছেন যে অর্থ পাওয়ার পশ্চাতে স্ত্রীসুলভ সন্তান পাওয়ার ইচ্ছা বর্তমান। অর্থ আদায়ের পশ্চাতে সন্তানের জন্ম দিয়া তাহার পিতা হবার পুরুষসুলভ ইচ্ছা বর্তমান। এক্ষেত্রে অর্থ সন্তানের প্রতীক। অর্থদান পুরুষসুলভ ইচ্ছা এবং ঠকবার ইচ্ছার পশ্চাতে স্ত্রীভাব বা passive homosexuality বা ভোগবৃত্ত সমকামিতা বর্তমান। অর্থ যেমন সন্তানের প্রতীক সেইরূপ অর্থ বীর্যেরও প্রতীক। শিশুমনে আবার অর্থ মলের প্রতীক। নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের ভেতরই অল্পবিস্তর স্ত্রীসুলভ ও পুরুষসুলভ উভয় প্রকৃতিই বর্তমান। আবার পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরও নির্জ্ঞানমনে শিশুসুলভ মলপ্রীতি দেখা যায়। এসব কথায় হঠাৎ হয়ত কারুর বিশ্বাস হবে না, কিন্তু মনঃসমীক্ষণ দ্বারা বহুক্ষেত্রেই এর যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে, বিশেষ বিশেষ কারণে এবং শৈশবের বিশেষ বিশেষ পরিগমে পুরুষপ্রকৃতি, স্ত্রীপ্রকৃতি, সমকামিতা প্রভৃতি যৌন

লক্ষণের স্বাভাবিক পরিণতির ব্যাঘাত ঘটে আর তখনই নানাপ্রকার মানসিক বিকারের বীজ রোপিত হয়। পরবর্তীকালে এই বীজ নানাভাবে পরিণতি লাভ করে। কখনও এই কারণে মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়, কখনও বা ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিক বিকৃতি ঘটে। কেহ বা কৃপণ হয়, কাহারও বা স্পেকুলেটর হবার আগ্রহ জন্মায়। স্পেকুলেটরের মনোবৃত্তির উৎপত্তি ব্যাপার আদৌ সরল নয়। এই প্রবন্ধে এ ব্যাপারের দু একটি মূল সূত্র বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন ও মনোবিদ্যা

ঐতিহাসিকরা পৃথিবীর নানারকম যুগের কথা বলেছেন, যেমন বরফের যুগ, পাথরের যুগ, লোহার যুগ ইত্যাদি। মানসিক পরিণতির দিক্ থেকে বিচার করে একজন ফরাসী দার্শনিক এক সময়ে বলেছিলেন যে আমরা দু'টি যুগ পার হয়ে এখন তৃতীয় যুগে পৌঁছেছি। প্রথম ছিল অযুক্তির যুগ, তখন মানুষের যুক্তির সাহায্যে বিচার করবার ক্ষমতা জাগেনি, কার্য কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়নি। তারপর এসেছিল ভগবান বিশ্বাসের যুগ। কার্যের যে কারণ আছে সে জ্ঞান জন্মেছে কিন্তু সকলে বিশ্বাস করত যে সব কার্যের কারণই এক অদৃশ্য অলৌকিক গুণসম্পন্ন সর্বশক্তিমান ভগবান। সে অবস্থাও পেরিয়ে তাঁর মতে এখন আমরা এসেছি বিজ্ঞানের যুগে। এখন আমরা আমাদের আধি ব্যাধির, দুঃখ দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ ভগবান মনে করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি না। শরীরের ভিতর ব্যাধির কারণ খুঁজি, দারিদ্র্যের কারণ নির্ণয়ের জন্য অর্থ এবং তাহার বণ্টন সম্বন্ধে গবেষণা করি। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে দুঃখ কষ্ট দূর করবার এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার চেষ্টা করি। ভগবৎ বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন অনুভব করি না।

ফরাসী দার্শনিকের সব ব্যাখ্যা এবং ভগবান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সব ধারণা মেনে না নিলেও এটা অস্বীকার করা

যায় না যে বর্তমান যুগকে এক কথায় বর্ণনা করতে গেলে বিজ্ঞানের যুগ কথাটাই সবচেয়ে বেশী উপযোগী। একটু ভেবে দেখলে সকলেই খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন পৃথিবীর বড় বড় ঘটনা থেকে আরম্ভ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য কাজকর্ম পর্যন্ত বিজ্ঞানের দ্বারা কতখানি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কতখানি আমরা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করছি। আমরা কলের জল খাই, ট্রামে-বাসে কোনও গতিকে একটা পা ঠেকিয়ে ঝুলতে ঝুলতে কর্মস্থলে পৌঁছই, বসন্ত রোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য টীকা নি—খবরের কাগজ পড়ে দেশ বিদেশের খবর সংগ্রহ করি, বড় বড় জাহাজে করে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের আহার্য আমদানী হয়, বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি দেশের কারখানা থেকে আমাদের পরবার কাপড় তৈরী হয়ে আসে। এই রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত আপনারা মনে করে নিতে পারবেন। বিজ্ঞান নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রোগীকে ফিরিয়ে আনছে, আবার এক মুহূর্তে সহস্র সহস্র লোককে একসঙ্গে ধ্বংস করবার জন্য আণবিক বোমাও তৈরী করছে। এ সব বিবেচনা করে দেখলে কে আর অস্বীকার করবেন যে আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি।

এতক্ষণ যে দৃষ্টান্তগুলির কথা বললুম সেগুলিকে আমাদের বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরতার স্থূল পরিচয় বলা যেতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান যে কত সূক্ষ্মভাবে আমাদের মনের ওপর কাজ করে তা আমরা অনেক সময়েই বুঝতে পারি না। এর একটা বিশেষ নিদর্শন হচ্ছে 'বিজ্ঞাপন'। আপনি যখন একটু

ইতস্ততঃ করে কোনও একটি বিশেষ দাঁতের মাজন কেনেন তখন জানতে পারেন কি যে আপনাকে ঐটি কেনাবার মূলে মনোবিজ্ঞানের অনেকখানি কাজ আছে ; বাড়ীর মেয়েদের জন্য গন্ধ তেল কিনতে হলে আপনি হিমকল্যাণ বা কোকোলার কথা মনে করেন না কি ? মনে যেন স্ফূর্তি নেই, শরীরে বল নেই, যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে যাচ্ছেন—এই রকম ভাব হচ্ছে কি ?—তাহলে Kruschen Salt একমাত্র ব্যবস্থা। আপনি জানেন না আপনি কি হারাচ্ছেন যদি না আপনি—ও আর বলার দরকার নেই—আপনাদের সকলেরই মনে পড়েছে। এ সব যদি আপনাদের না মনে পড়ে থাকে তাহলে খবরের কাগজে রাস্তায় ঘাটে রেলস্টেশনে এই জিনিসগুলির সম্বন্ধে যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয় নি। একথা কেন বললুম ? বললুম এই জন্যে যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপিত জিনিসের কথা আপনার দরকারের সময় মনে করিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া অবশ্য বিজ্ঞাপনের অন্য উদ্দেশ্যও আছে। সেগুলি কি এবং কি ভাবে সাধিত হয় ?

আপনি একটি নতুন সাবান কিম্বা তেল তৈরী করছেন। লোকে তেল, সাবান কিনে থাকে। আপনি চান লোকে আপনার তেলটিই কিনুক। তাহলে লোকদের আপনাকে জানাতে হবে যে আপনি তেল তৈরী করেছেন। এমন করে জানাতে হবে, যাতে তেল কেনবার সময় তারা আপনার তেলের কথা মনে করে। আবার যদি এমন করে জানান

যাতে যারা সচরাচর গন্ধ তেল কেনেনা তাদের মনেও কেনবার একটা ইচ্ছা জাগিয়ে তোলেন তাহলে আপনার আরও বেশী বিক্রী হবে, আপনার লাভ আরও বেশী হবে। আরও দেখুন, কেনবার সময় লোকের মনে দ্বিধার উদয় হয়, এটা কিনি কি ওটা কিনি। এমন ভাবে আপনার তেলের কথা জানাবেন যাতে এ সমস্যার সমাধান আপনার স্বপক্ষে হয়। পয়সাটা খরচ করা উচিত কিনা কেনবার সময় ক্রেতার মনে যে সমস্যা জাগে তাও অতিক্রম করাতে হবে। এমন করতে হবে যাতে সে আপনার তেল, সাবান কেনেই। এখন এ সমস্তই হল বিজ্ঞাপনের কাজ। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যই হল আপনার মনে কেনবার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা, বিজ্ঞাপিত জিনিসের কথা মনে করিয়ে দেওয়া এবং সমস্ত দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে জিনিসটি কেনান।

আরও দেখুন এই 'মনে করা' 'ইচ্ছে জাগান', দ্বন্দ্বের মীমাংসা এসবই মানসিক ব্যাপার। মনোবিদ্যা এই সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোচনা করে। তাই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। বলা যেতে পারে মনোবিদ্যাই বিজ্ঞাপনের ভিত্তি। কারণ মনোবিদ্যা মনের গতি ও তার কার্যের ধারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব তথ্য আমাদের জানিয়েছে সেগুলি কাজে লাগাতে না পারলে বিজ্ঞাপন কার্যকরী হয় না।

বিজ্ঞাপন অনেক রকমে দেওয়া যায়। খবরের কাগজের সাহায্যে, মাসিক পত্রিকায়, রাস্তায় ছাপা কাগজ মেরে,

ডাকে, সিনেমায়, পাশ্চাত্য দেশে রেডিওর সাহায্যেও দেওয়া হয়। ছাপার সাহায্যে বিজ্ঞাপনের কথা বলি। খবরের কাগজ অনেক লোকে পড়ে। সুতরাং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার তেলের কথা অনেক লোকে একসঙ্গে জানতে পারে। কিন্তু এমনভাবে তা ছাপাতে হবে যাতে পাঠকদের মনোযোগ আপনার তেলের কথার দিকে আকৃষ্ট হয়। এইখানে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মনোবিদ্যার প্রথম যোগাযোগ। লোকের মন কিসে আকৃষ্ট হয়? একটি উপায়, যেটা খবরের কাগজ প্রভৃতিতে খুব কার্যকরী সেটা হচ্ছে পুনঃ পুনঃ এক কথা বলা। প্রত্যহই এক কথা খবরের কাগজের এক জায়গায় দেখলে লোকের মন সে দিকে যাবে এটা বলা যায়। Insure it with Gillanders, Born 1820. still going strong প্রভৃতি আপনারা প্রায় রোজই দেখেন। রোজ দেখতে দেখতে মনোযোগ ত যায়ই উপরন্তু যে সব গুণের কথা আছে সেগুলো সত্যি বলে খানিকটা বিশ্বাসও এসে যায়। একটা মিথ্যা কথা বার বার বলতে থাকলে অনেক লোকের মনে ধারণা জন্মান যায় যে কথাটা সত্যি। রাজনীতি ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা খুবই চলে তাত জানেন। তারপর বিজ্ঞাপনের ভাষার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অনেকের ধারণা বিজ্ঞাপনের ভাষা রচনা করা কিছুই শক্ত কাজ নয়। যাদের একটু লেখায় অভ্যাস আছে তারা অনায়াসেই পারে। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয় একেবারেই। উপযুক্ত

ভাষা রচনা করা একটা শিল্প বিশেষ, 'art'। 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে' আর 'নীরস তরুবর পুরত ভাগে' দুটোর মানে একই কিন্তু ভাষা হিসাবে দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। ভাষার সঙ্গে কোনও একটি উপযুক্ত ছবি থাকলে মনোযোগ বেশী আকৃষ্ট হয় কি না তাও বিবেচনা করার কথা। ছবি যদি থাকে রং কি রকম হবে। সাধারণত লোকে কোন্ রং এবং রংয়ের সমাবেশ পছন্দ করে আর পছন্দ করে না তা জানা দরকার। বড় একটা ছবি আর অল্প একটু বিজ্ঞাপন কিংবা অর্ধেক ছবি অর্ধেক বিজ্ঞাপন, কিম্বা ছোট ছবি বেশী লেখা—কোন্‌টা বিশেষ কার্যকরী? ছবি সম্বন্ধে কোন একটা সাধারণ নিয়ম বলা যায় না। বিজ্ঞাপিত জিনিসের ওপর সেটা অনেকটা নির্ভর করে। ভাষা ছাড়াও ছাপার হরপ, লাইন প্রভৃতি সব বিষয়েই দৃষ্টি দিতে হয়। এই সব বিষয়ে মনোবিদ্যা আজকাল অনেক গবেষণা করছে। একটা স্থায়ী আর একটা চল্‌তি জিনিসের ভেতর চল্‌তি জিনিসটাই মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী। Esplanade-এর মোড়ে এবং অন্য জায়গাতেও চলন্ত আলোর সাহায্যে Rasoi, Hamam, Lipton's Tea প্রভৃতি নানারূপ বিজ্ঞাপনের কথা আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। খবরের কাগজে ঠিক এই জিনিস সম্ভব না হলেও ভাষার ভেতর দিয়ে গতির ইঙ্গিত করা যায়।

কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করাই ত বিজ্ঞাপনের একমাত্র কাজ নয়। মনোযোগ দিয়ে কোন জিনিস দেখলে বা

কোন কথা শুনলে মনে থাকবে এটাও ধরে নেওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের বড় কথা হচ্ছে কেনবার ইচ্ছে জাগান। এমন ভাবে জাগাতে হবে যাতে সংজ্ঞানে কেনবার প্রতিবন্ধক যে সব যুক্তির সচরাচর উদয় হয় তাদের অতিক্রম করা যায়। তা করতে হলে বিশেষ করে প্রথমত জানা চাই কি ধরণের আপত্তির কথা মনে উঠতে পারে। সেইগুলো বেশ করে ভেবে নিয়ে বিজ্ঞাপনের ভেতর এমন ইঙ্গিত দিতে হবে যাতে সে আপত্তিগুলোর গুরুত্ব নিজের কাছেই কমে যায়। এইখানেই বিজ্ঞাপনের বাহাদুরী। কারুর কারুর বিশ্বাস জোর গলায় চেঁচিয়ে আমার তেল সব তেলের চেয়ে ভাল, আপনাকে কিনতেই হবে বলে সবাইকে কেনান যায়। একথা অবশ্য ঠিক যে যুদ্ধে ভারী ভারী গোলাগুলির সাহায্যে অনেক সময়ে শত্রুপক্ষের সব বাধা ধ্বংস করে অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু তাই বলে সেইটেই যে একমাত্র পন্থা বা সব সময়েই ভাল পন্থা একথা কেউই মানে না। জোর করে আপনি হয়ত কাউকে আপনার তেল কেনালেন, কিন্তু যখনই তার মনে হবে যে আপনি তাকে কিনতে বাধ্য করেছেন তখনই তার মনে আপনার ওপর একটা বিরক্তির ভাব জাগবে। তখন তার তেল কেনার আনন্দের পরিবর্তে একটা আশঙ্কাই জড়িয়ে থাকবে। তাতে আপনার ভবিষ্যতে তেল বিক্রীর কি সুবিধে হবে? যদি আপনি বলেন যে আপনার তৈরী ক্রীম কিম্বা পাউডার মাখলে আপনি সুন্দরী হবেন—তাতে খুব বেশী ফল

াশা করা যায় না। কারণ শতকরা ৯০ জন স্ত্রীলোকই মনে নে জানেন যে তাঁরা সুন্দরী নন, আপনি জোর করে তাদের খের ওপর সেই লুকানো কথাটাই ব্যক্ত করে তাঁদের শুনিয়ে চ্ছেন, এই ভাবেই তাঁরা আপনার বিজ্ঞাপনটা গ্রহণ রবেন, ফলে একটা বিদ্বেষই জন্মাবে। এ ক্ষেত্রে বরং ৌন্দর্য কথাটা একেবারে বাদ দেওয়াটাই ভাল। বলুন াপনার আকর্ষণ শক্তি বাড়বে, আপনার মাধুর্যে লোকে ভিভূত হবে ইত্যাদি। এই রকম ভাষা ব্যবহার করলে মন কোনও ভাবের উদয় হবে না যা সংজ্ঞানে বাধা পেতে রে। বরং এতে কেনবার ইচ্ছেটা আর একটু প্রবলই ব।

এইখানে আমাদের নির্জ্ঞান মনের কথা কিছু বলতে । নির্জ্ঞানস্তরের ইচ্ছা সংজ্ঞানস্তরের ইচ্ছার চেয়ে যে ঢের শী শক্তিশালী একথা আমরা জেনেছি। মনের নির্জ্ঞানস্তরে মাদের প্রত্যেকেরই যে অনেক রকম ইচ্ছা থাকে তা ান আর আপনাদের কারুরই অবিদিত নেই। বাল্যকালের ভিজ্ঞতার ফলে এক একটা জিনিসের সঙ্গে বিশেষ শেষ চিন্তা ভাব এমন ভাবে জড়িয়ে যায় যে সারা বনেও তা আর বিচ্ছিন্ন হয় না। কোন জিনিসের সঙ্গে নন্দের ভাব, কোনটার সঙ্গে নিরানন্দ, ভয় যুক্ত হয়ে কে। বিজ্ঞাপনে যদি আমরা সেই নির্জ্ঞান মনে ঘা ত পারি এবং সেই আদিম আনন্দকে জাগাতে পারি লেই বিজ্ঞাপন সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়। অবশ্য

প্রত্যেক লোকেরই নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা এক রকম নয় বা আনন্দ, আশঙ্কা একই জিনিসে যুক্ত হয় না তবে কতগুলি ইচ্ছা সকলেরই যে একরকম আছে তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং কতকগুলি নিয়ম কানুন এবং কৌশল সব বিজ্ঞাপনেই প্রয়োগ করা যায়।

একটা ভাল সাবান কিছুতেই বাজারে চল্‌ল না। একজন মনোবিদ্ পরীক্ষা করে দেখলেন যে ঐ সাবানটির নামের সঙ্গে কতকলোকের মনে একটা ঘৃণ্য পোকার নাম জড়িয়ে আছে। কয়েকজন স্ত্রীলোক সাবানটির নাম শুনলেই তাঁদের একটা disinfectant-এর কথা মনে পড়ে, আরও জনকতক স্ত্রীলোক বললেন সাবানটার বিজ্ঞাপন দেখলেই তাঁদের কোঁকড়ান অমসৃণ চামড়ার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তেমনি একটি pianoর সঙ্গে দেখা গেল শতকরা ৭০ জন লোকের মনে শবযাত্রা প্রভৃতির চিন্তা যুক্ত হয়ে আছে। এখন বোধ হয় বুঝতে পারবেন কেন ঐ সাবান বা পিয়ানো বাজারে তেমন চলেনি।

মনোবিদ্যার দিক থেকে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে খুব সাধারণ ভাবে কতগুলি কথা বলা যায়। অন্তত ৩ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত বিজ্ঞাপন চালান উচিত। একবার বিজ্ঞাপন দিয়ে অনেকদিন যদি আর না দেওয়া হয় তাতে কাজ বিশেষ হয় না। আপনি যদি একদিন আমাকে বলেন যে 'ক' লোকটি বড় ভাল লোক আমার হয়ত বিশেষ কিছু হবে না। কিন্তু রোজই যদি একবার করে ঐ কথাটি বলতে থাকেন তাহলে

দিন কতক বাদে আমার মনেও দৃঢ় ধারণা হয়ে যাবে যে 'ক' লোকটি অতিশয় ভাল লোক। প্রত্যহ বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে ঐ রকমই হয়। কারণ দুইটিরই মূলগত মানসিক ব্যাপার একই।

যে শ্রেণীর লোক আপনার জিনিস কিনবে মনে করেছেন তাদের অভ্যাস, ইচ্ছা, কি কাগজ তাঁরা পড়েন, কখন পড়েন, আপিস যাবার সময় তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নেন, না রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ধীরে সুস্থে পড়েন প্রভৃতি খুঁটিনাটি তাঁদের সম্বন্ধেও যত বেশী জানতে পারেন ততই ভাল। কারণ তা হলে কোন্ কাগজে, দিনের বেলার কাগজে না সান্ধ্য কাগজে, কি রকম ভাষায়, বড় অক্ষরে না ছোট অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিলে বেশী কাজ হবে তা আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

উপযুক্ত বিজ্ঞাপনে যথেষ্ট অর্থব্যয় করাকে অর্থের অপব্যয় মনে করা ভুল। পাশ্চাত্য দেশে এটা খুব ভাল করেই লোকে উপলব্ধি করেছে। আমাদের দেশের এ তথ্যটি সম্যক উপলব্ধি বোধ হয় অনেকেই এখনও করেন নি।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই মনে হয় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ। কারণ অত্যন্ত কম খরচে, অত্যন্ত কম সময়ে সবচেয়ে বেশী লোকের কাছে আপনার জিনিসের খবর পাঠাতে খবরের কাগজের মত আর কিছুই পারে না।

কেউ কেউ বলেন যে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে জিনিস বিক্রয় করার চেষ্টা করা একটা অন্যায় কাজ। কারণ বিজ্ঞাপন মাত্রেই অত্যুক্তি করা হয় এবং তার ফাঁদে ফেলে খারাপ

জিনিস চালিয়ে দেওয়া হয়। এটা কিন্তু সত্য নয়। যদি কেউ মনে করেন যে তাঁর মেকি জিনিস বিজ্ঞাপনের জোরে চালিয়ে দেবেন তিনি খুব ভুল করবেন। দুদিনেই জিনিসের নিকৃষ্টতা লোকের কাছে ধরা পড়ে যাবে এবং তার বিক্রিও বন্ধ হয়ে যাবে। উপরন্তু তিনি পরে আর ভাল জিনিস তৈরী করলেও লোকে আর তার কথায় ভুলবে না।

বিজ্ঞাপনের ফলে একটা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে অনর্থক অর্থের অপব্যয় করান হয় বলে নীতিশাস্ত্রকারেরা বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন অভাব সৃষ্টি করে না, কি করে অভাব বোধ নিবারণ করা যায় তাই দেখিয়ে দেয়। জিনিস আহরণ করবার একটা সহজাত প্রবৃত্তি (acquisitire instinct) মানুষ মাত্রেরই এবং অনেক জন্তু জানোয়ারেরও আছে। বিজ্ঞাপন শুধু এইটের বদলে ঐটে আহরণ করতে বলে নতুন করে অভাব সৃষ্টি করে না। জিনিস দেখলে রাখবার ইচ্ছাও সকলেই কিছু না কিছু পোষণ করেন। কেউ চান মোটর গাড়ী, কেউ চান আসবাব, কেউ বই, কেউ পোষাক। বিজ্ঞাপন এই আশা মেটাবার একটা পথ দেখিয়ে দেয় মাত্র। সুতরাং দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে বিজ্ঞাপন আমাদের অবনতির পথে নিয়ে যায় এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

আমাদের যুগ বিজ্ঞানের যুগ এই কথা বলে আরম্ভ করেছি। এখন শেষ করতে চাই এই বলে যে আমাদের যুগ বিজ্ঞাপনের যুগ। এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে বিজ্ঞাপনের

সাহায্য ভিন্ন কোন জিনিসই এমন কি কোন চিন্তাধারাও প্রচার করা যায় না। জিনিস তৈরী, ব্যবসা, বাণিজ্য যত বাড়বে বিজ্ঞাপনের দরকারও তত বেশী হবে। এই বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতাতেও সেই বিজ্ঞাপনই জয়ী হবে—যে মনো-বিজ্ঞানের তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্যক্তিত্ব

অনেকেরই ধারণা আছে যে ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা যা বুঝি তার সন্ধান শুধু মহাপুরুষ বা অসাধারণ লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। স্যার আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ-চন্দ্র, পণ্ডিতজী, এঁদের মত লোকেরাই কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁদের অসাধারণত্বই তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচয়। কথাটির অর্থের দিক থেকে বিবেচনা করলে কিন্তু এ ধারণা সঙ্গত বলে মনে হয় না। ব্যক্তিমাত্রেরই, তিনি অসাধারণই হউন বা সাধারণই হউন, ব্যক্তিত্ব আছে। পৃথিবীর কোনও দুজন মানুষই একরকমের নয়। শরীরের গঠন এবং মনের গুণাবলী প্রত্যেক লোকেরই তফাৎ। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর সমষ্টির ওপরই মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। যাঁদের মহাপুরুষ বা অসাধারণ বলি তাঁদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে এই শারীরিক এবং মানসিক গুণাবলীরই বিশ্লেষণ করতে হয়। সাধারণত যে সমস্ত গুণের পরিচয় আমরা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাই, কোন এক ব্যক্তির মধ্যে সেই সব গুণের একটির বা একাধিকের বিশেষ ব্যতিক্রম দেখলে তাঁকে আমরা অসাধারণ ব্যক্তি বলে থাকি। সমাজের আদর্শ বা নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ড অনুসারে আমরা এই অসাধারণত্ব সম্বন্ধে বিচার করে মন্তব্য

প্রকাশ করি—বলি, অসাধারণ লোকটি সাধু কিম্বা অসাধু, মহাত্মা বা দুরাত্মা, ভাল কিম্বা মন্দ ইত্যাদি।

আধুনিক মনোবিদ্যা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করছে। একজন লোকের ব্যক্তিত্ব যে অপর একজন লোকের ব্যক্তিত্ব থেকে তফাৎ তা সহজেই সকলে বুঝতে পারেন। কিন্তু তফাৎটা ঠিক কোথায় এবং কতখানি তা স্থির করতে গেলেই নানা রকম সমস্যার উদয় হয়। মনোবিদ্যা সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে। মনোবিদ্‌দের মতে ব্যক্তিত্ব যে কতকগুলি শরীরের ক্রিয়াবলি এবং মনের বৃত্তির ওপর প্রধানত নির্ভর করে, সে কথা আগেই বলেছি। দুটি শিশুর জন্মগত কতকগুলি শারীরিক প্রভেদ থাকে। কোন শিশুর ওজন বেশী কারও কম, একের স্নায়ু আর মস্তিস্কের কর্মশক্তি প্রবল, অন্যের অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কোন শিশু সর্বাঙ্গ-সুন্দর অন্য একটি বিকলাঙ্গ ইত্যাদি। এই ধরণের নানা রকম স্থূল এবং সূক্ষ্ম বিভিন্নতা শারীরতত্ত্ববিদ্‌রা লক্ষ্য করেছেন। পূর্ণবয়স্কদের ব্যক্তিত্বের তফাতের একটা ভিত্তি আমরা এইখানে পাই। শরীরের ভেতর যে সমস্ত নালীবিহীন গ্রন্থি (Endocrine Glands) আছে তাদের কার্যকলাপের বিভিন্নতা ব্যক্তিত্বের তফাতের আর একটি কারণ। একজন যৌনতত্ত্ববিদ্ বলেছেন যে স্বভাবে এবং শরীরে পুরোপুরি পুরুষ (Cent-percent male) এবং দেহে ও মনে পুরোপুরি নারীর Cent per cent female) মধ্যে অনেকগুলি স্তর ঠিক

করা যায়। আকৃতিতে পুরুষ কিন্তু প্রকৃতিতে মেয়ে এবং ঠিক এর উল্টো অর্থাৎ আকৃতিতে মেয়ে আর প্রকৃতিতে পুরুষ এরকম লোকের সন্ধান আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে খুঁজলে আপনারা সকলেই পাবেন। কোন কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ তাই এই মত প্রকাশ করেছেন যে এই নালীহীন গ্রন্থিগুলোর কার্যকলাপের ওপরই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই মত অবশ্য পুরোপুরি মানা যায় না; তবে শরীরের যন্ত্রাদি এবং তাদের কার্যকলাপের ওপর ব্যক্তিত্ব যে অনেকখানি নির্ভর করে এ কথা অস্বীকার করাও যায় না।

মনের যে সমস্ত বৃত্তি বা গুণের ওপর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে মনোবিদ্রা সেগুলোর বর্ণনা করতে চেষ্টা করছেন। কয়েকটি বৃত্তির ইঙ্গিত এখানে দিচ্ছি।

বুদ্ধি নিশ্চয়ই ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ লক্ষণ। দুজনের ব্যক্তিত্ব তুলনা করতে হলে দুজনের বুদ্ধির তারতম্য সহজেই চোখে পড়ে। মনোবিদ্রা এই বুদ্ধি বিষয়টির বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার পরিমাণ ঠিক করবার জন্যে কতগুলি অভীক্ষা (Test) সৃষ্টি করেছেন। এই অভীক্ষার সাহায্যে একজনের বুদ্ধি আর একজনের চেয়ে কতখানি বেশী বা কম, কোন্ শিশু ভবিষ্যতে অতিশয় মেধাবী (genius) এবং কোন্ শিশু প্রায় বুদ্ধিহীন হবে তা আমরা আজকাল অনেকটা ঠিক করতে পারি।

বুদ্ধির বৈষম্য যেমন চোখে পড়ে তেমনি মেজাজের তারতম্যও আমরা অনবরতই লক্ষ্য করি। কোন কোন

লোক সব সময়ই যেন রেগে থাকেন, আবার এমন লোকও আছেন যাঁকে কিছুতেই যেন রাগানো যায় না। একজন খুব সামান্য কারণেই বিচলিত হয়ে পড়েন, আবার আর একজনের ধৈর্যচ্যুতি গভীর কারণ না হলে হয়না। কেউ ভীরু, কেউ সব সময় সন্দেহমান। কেউ বেশী প্রফুল্লচিত্ত, যেখানেই যান সেখানেই আনন্দ ছড়িয়ে দেন, আবার কারুর স্বভাব ঠিক এর বিপরীত, সব সময়ই বিষাদগ্রস্ত, তাঁর সাহচর্যে অন্য লোকের আনন্দও যেন নিরানন্দে পরিণত হয়। কেউ হিংসাপরায়ণ কেউ ক্ষমাশীল। মেজাজের এই ধরণের বিভিন্নতার দরুণ নানা রকম ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। তাই মেজাজকে (temperament) ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলবার আর একটি বিশেষ অঙ্গ বলেই মনোবিদ্‌রা মনে করেন। বিখ্যাত মনোবিদ্ ইয়ুং (Jung) মানুষদের দুভাগে ভাগ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে কতকগুলি লোক সব সময় বাইরের জিনিস নিয়েই ব্যস্ত থাকে; নিজেদের মনের দিকে দৃষ্টি তারা খুব কম সময়ই দেয়। এই ধরণের লোক দলের নেতা হতে চায়, সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে অগ্র পশ্চাত না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের বহির্বৃত (Extiovert) বলা হয়। তেমনি আবার কোন কোন লোক সব সময় নিজেদের মরমের কথা অন্তরের ব্যথা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। বাইরের ঘটনার দিকে বিশেষ মনযোগ খুব কম সময়ই দেয়। এরা সব সময় সব কাজে

পেছিয়ে থাকতে ভালবাসে। কোন একটা কথা বললে বা কোন একটা কাজ করলে লোকে তাদের সম্বন্ধে কি ধারণা করবে এই চিন্তাই তাদের বিব্রত করে তোলে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে অন্তর্বৃত (Introvert)।

অন্তর্দৃষ্টি, উদ্যমশীলতা, সামাজিকতা প্রভৃতি আরও কতকগুলি বৃত্তির কথা মনোবিদ্‌রা বলেছেন যেগুলি ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলবার সাহায্য করে। শিশু যেসব বৃত্তি নিয়ে জন্মায় সেইসব বৃত্তি এবং যে পরিবেশের মধ্যে সে মানুষ হয় সেই পরিবেশ এই দুটির উপর ভিত্তি করেই তার ভবিষ্যত ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিশুর প্রথম পরিবেশের ভেতর তার বাবা মার প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। কাজেই ব্যক্তিত্ব গঠনের গুরুদায়িত্ব প্রধানত তাঁদেরই। মা বাপেরা তাঁদের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে যত বেশী এবং যত শীঘ্র সচেতন হবেন সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল হবে।

দ্বন্দ্ব

দ্বন্দ্বের নৃশংস অভিব্যক্তি পৃথিবীর চারিদিকে সম্প্রতি আমরা দেখেছি; আবার একবার দেখবার সম্ভাবনাও হয়ত আছে। ইতিহাসে দেখি জাতিতে জাতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশে দেশে সংঘর্ষ চিরকাল হয়ে আসছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন প্রাগৈতিহাসিক কালে অসভ্য জাতিদের মধ্যেও সংগ্রাম প্রায়ই হত। মানুষ তার বুদ্ধি এবং কর্মকৌশলতার সাহায্যে প্রথম যে অস্ত্র নির্মাণ করেছিল তা বোধ হয় মারণাস্ত্রই। আজ আবার সভ্যতার চরম নিদর্শন আণবিক বোমা। Darwin আরও প্রাচীন যুগের কথা বলেন যখন মানুষ নামধেয় জীবের সৃষ্টি হয়নি; তখনকার জন্তু জানোয়ারদের বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায়ই ছিল পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বে যে জাতীয় জন্তু পরাজিত হয়েছিল তাদের অস্তিত্বই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। জীবন সংগ্রাম কথাটিতেও আমরা এই ইঙ্গিতই যেন পাই। বাঁচতে হলে সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। সংগ্রাম অনিবার্য স্বীকার করে নিলেও তার অর্থ কি এই যে মানুষকে যে কোন উপায়ে হত্যা না করলে মানুষ বাঁচতে পারে না। ইউরোপকে বাঁচতে হলে এশিয়াকে কি মরতেই হবে? আমেরিকার জীবন-স্পন্দনের দ্রুত বেগ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জকে কি মহাসাগরের অতল গর্ভে লীন হতেই

হবে? অথবা অতদূর যাবারই বা দরকার কি? ভারতবর্ষে হিন্দুর অস্তিত্ব বজায় রাখতে মুসলমানের সমূহ বিলোপ কি একান্ত প্রয়োজন? পাকিস্থানে হিন্দুর সমূলে উচ্ছেদ ভিন্ন কি মুসলমান বাঁচতে পারে না? রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁরা বিচরণ করেন অন্যান্য বহুপ্রকৃতির রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বের সংবাদ তাঁরা দিতে পারেন। সামাজিক জীবনেও আমাদের দ্বন্দ্বের অভাব নেই। বিভিন্ন জাতির (caste) মধ্যে, ধনী দরিদ্রের ভেতর, মালিক মজুরের ভেতর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর, শুধু বিভিন্ন ধর্ম কেন, একই ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতর দ্বন্দ্বের অভাব কি? সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা এই সমস্ত দ্বন্দ্বের আলোচনা করেন।

কিন্তু সমাজ কি? কার সুখ দুঃখের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক কর্মপদ্ধতি গঠিত হয়, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হয়? আপনার, আমার, এক একটি ব্যক্তির সমষ্টিতেই ত সমাজ। আপনি সমাজের অনুশাসন মেনে চলেন বলেই ত সমাজ গড়ে ওঠে, ওর ভিত্তি দৃঢ় হয়। আপনি যদি না মানেন, আমি যদি না মানি, আর দশজনেও যদি না মানেন, তা হলে সমাজের বন্ধন আপনা আপনিই শিথিল হয়ে যায়, সমাজ ভেঙ্গে পড়ে। সুতরাং সমাজের নামে যা কিছু বলা যায়, সমাজে যা কিছু ঘটে, আপনার আমার যোগাযোগ তাতে থেকেই যায়। সে হিসাবে সামাজিক দ্বন্দ্ব একপ্রকার আপনারই দ্বন্দ্ব, এটা হল অবশ্য তর্কশাস্ত্রের বিচার। এই যোগাযোগ যদি শুধু একটি বাহ্যিক ব্যাপার হত তা হলে হয়ত এ সম্বন্ধে বেশী আর কিছু

বলবার প্রয়োজন হত না। কিন্তু একটু বিবেচনা করলেই বুঝতে পারা যায় যে যোগাযোগ ব্যাপারটি শুধু একত্র উপাস্থিতির ওপরই নির্ভর করে না। মানসিক ঘটনাবলীর ওপরও এর ভিত্তি স্থাপিত, পাঁচজন ব্যক্তি একসময়ে একদেশে অবস্থান করলেই সমাজ হয় না, যখন সেই ব্যক্তিদিগের চিন্তা, ভাব এবং কর্মধারার গতি এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে একত্ব গড়ে উঠে এবং মানসিক আদান প্রদান চলতে থাকে তখনই সত্যিকারের সমষ্টি তৈরী হয়। পুরাকালে এরকম ভাবেই সমষ্টি এবং সমষ্টি থেকে ক্রমে বৃহত্তর সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল, তদানীন্তন সমাজ বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন ধরণের আদর্শ স্থাপন করে গেছে, ধর্মকর্মের নির্দেশ দিয়েছে, তাই আমরা আমাদের ঐতিহ্য, প্রথা প্রভৃতি হিসাবে পেয়েছি এবং আমাদের জীবন তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত করছি। এই হল সমাজ অভ্যুদয়ের মোটামুটি কথা।

কিন্তু এর মধ্যে দ্বন্দ্বের স্থান কোথায়? তা বুঝতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বিপ্লবীদল শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান করছে—এর অর্থ এই যে বিপ্লবীদলভুক্ত প্রত্যেক লোকটিই বিদ্রোহ করছে। দলভুক্ত প্রত্যেক লোকের মনে বিদ্রোহ ভাব যদি না জাগত তাহলে বিদ্রোহমূলক কার্যধারা কাদের দিয়ে চলত? দল ত একটি অশরীরী বস্তু নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিপ্লব নামক সামাজিক দ্বন্দ্বের মূলে ব্যক্তিবিশেষের মনে বিদ্রোহের ভাব বিদ্যমান রয়েছে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে সহজেই

হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে সমাজগত সমস্ত নতুন আলোড়ন (movement)-এর পেছনে ব্যক্তিবিশেষের নতুন অনুভূতি, চিন্তা, বিদ্রোহভাব এবং পরিবর্তনের চেষ্টা বর্তমান আছে, এবং ব্যক্তি বিশেষের মনে দ্বন্দ্বের উদয় না হলে সমাজের কোন পরিবর্তনই সম্ভব হয় না। এখন প্রশ্ন হল এই—ব্যক্তির মনে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হবার কারণ কি এবং সে দ্বন্দ্বের স্বরূপই বা কি ?

সাধারণভাবে বলা যায় যে দ্বন্দ্ব দু'রকমের—প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য। শিশু খেলনাটি চায়। আর একটি শিশু সেটি নেবার প্রয়াসী। প্রথমোক্তটি সোজাসুজি দ্বিতীয় শিশুকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খেলনাটি নিয়ে গেল। দুই শিশুর এই সংঘর্ষ প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। বাসনার বস্তুকে সংগ্রহ করবার জন্যে এইভাবে অগ্রসর হওয়াকে অর্থাৎ দৈহিক বলের সাহায্য নেওয়াকে আমরা স্থূল অসভ্যজনোচিত পথ বলে বিবেচনা করি। সভ্য সমাজে এই ব্যবস্থার প্রশ্রয় দিতে আমরা কুণ্ঠিত হই এবং আইন, লোকমত প্রভৃতির সাহায্যে এরকম ব্যবহার নিবারণ করবার চেষ্টা করি, কতদূর কৃতকার্য হয়েছি বলতে পারি না। গত মহাযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আমাদের সফলতার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সাক্ষ্য দিতেছে। প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বকারীর একপক্ষে আমি, অন্যদিকে আর এক ব্যক্তি। যে দ্বন্দ্বে পক্ষ এবং প্রতি-পক্ষ দুই-ই আমি তাকেই অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বলে বর্ণনা করা হয়। একটি অতিশয় দুঃস্থ ক্ষুধার্ত যুবক একটি ভদ্রলোকের

সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিছু অর্থ সাহায্যের আশায়। ভদ্রলোক ঘরে ছিলেন না কিন্তু তাঁর টেবিলের উপর একখানি দশ টাকার নোট চাপা দেওয়া ছিল। নোটখানি সে সহজেই নিয়ে চলে যেতে পারত; কেউ তাকে ধরতে পারত না। নেবার ইচ্ছাও তার মনে খুব তীব্রভাবে জেগেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিলেনা, চলে গেল। নিই, কি না নিই, এই দ্বন্দ্বের দুই পক্ষই যুবক নিজে। একদিকে নোটখানি নিয়ে তার সাহায্যে ক্ষুধা নিবারণের তীব্র বাসনা, অন্যদিকে আদর্শ-চ্যুতি হেতু নিজের কাছেই নিজে অপরাধী বলে বিবেচিত হবার উৎকণ্ঠা। এই বাসনা এবং উৎকণ্ঠার দ্বন্দ্ব অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্ব।

প্রকাশ্যই হোক্ অপ্রকাশ্যই হোক্ দ্বন্দ্বমাত্রেরই মূল উৎস হচ্ছে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার প্রয়াস। প্রত্যেক শিশুই কয়েকটি প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। নীতির দিক থেকে বিচার করে সমাজ তাদের কতকগুলি ভাল বলে বিবেচনা করে এবং শিশুর সেই প্রবৃত্তিগুলির বিকাশের পথ সুগম করে দেয়। কতকগুলিকে অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত করে তাদের স্ফূরণের বা অভিব্যক্তির পথে বাধা দেয়। সমাজের এই অনুশাসন শিশুর ওপর কার্যকরী হয় পিতামাতার মধ্যস্থতায়। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ভার তাঁদের ওপর। তাঁরাই তাদের 'কোরোনা', 'বোলোনা', পুরস্কার, শাস্তি প্রভৃতির সাহায্যে শিশুকে সমাজের প্রচলিত আইন কানুন, রীতি-নীতির গণ্ডির ভেতর এনে ফেলেন। পিতামাতার শাসন মেনে নেওয়া কিন্তু শিশুর পক্ষে সর্বদা সহজ হয় না।

যে জিনিসটি শিশু তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে পিতা যখন সেটি তার ভাইকে দিতে বলেন এবং না দিলে শাস্তি দেবার ভয় দেখান তখন শিশুর মনে একটা দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের উদয় হয়। একদিকে প্রবল ইচ্ছা আর একদিকে শাস্তির ভয়। ভবিষ্যৎ জীবনের সকল দ্বন্দ্বই এই দ্বন্দ্বের অনুরূপ। এখন শিশুমনের এই দ্বন্দ্বের ফল বহুধা হতে পারে। শিশু হয়ত ভাইকে খেলনাটি দিল কিন্তু তার মনে পিতা এবং ভ্রাতা দুজনের বিরুদ্ধেই একটি আক্রোশের ভাব জাগল, যা সে তখন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে নাও পারে। বারে বারে যদি এরকম ঘটনা ঘটে এবং তার সমস্ত বাসনাই পিতা কর্তৃক ব্যাহত হতে থাকে, তাহলে এই পুঞ্জীভূত, অবরুদ্ধ বিদ্বেষ এবং আক্রোশের ভাব ভবিষ্যতে অন্য কোন বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি বা অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করে ব্যক্ত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। হয়ত এই ধরণের শিশু থেকেই ভবিষ্যৎ বিপ্লবীর দল গঠিত হয়। শিশু পিতার আদেশ অমান্য করে প্রহারের ভয় অগ্রাহ্য করে জিনিসটি নিজের কাছেই রাখল, ভাইকে দিল না। এ দ্বন্দ্বে কামনারই জয় হল। ভাইকে ঠকিয়ে, লোকলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে যাঁরা পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করেন, তাঁদের বাল্যকাল কি এইভাবে কেটেছিল? অথবা অন্য একটি খেলনা পেয়ে শিশু এই খেলনাটির লোভ ত্যাগ করল। অপুত্রকের কুকুর বিড়াল পোষা এই জাতীয় কি? শৈশবের দ্বন্দ্বসমূহের বহুভাবে সমাধা হতে পারে এবং প্রত্যেক

সমাধানের পথই নানারকম কল্পনা, প্রক্ষোভ (emotion) মাতা পিতা প্রভৃতির প্রতি মনোভাব এই সবের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষ বিশেষ মানসিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। ব্যক্তিবিশেষের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে গড়ে উঠবে এবং ভাবীকালের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করবেন তা শৈশবের এই মানসিক পরিবেশের দ্বারাই প্রায় স্থিরীকৃত হয়ে যায়। শৈশবের সমস্যাসমূহের সমাধানের পথে বিঘ্ন ঘটলে ভবিষ্যৎ মানসিক ব্যাধির বীজ উপ্ত হয়।

পরিণত বয়সের বহু দ্বন্দ্বের কথা সকলেই অবগত আছেন। প্রেম এবং কর্তব্যের দ্বন্দ্ব অনেক উপন্যাস এবং ছায়াচিত্রের উপাদান যুগিয়েছে। মাতৃভক্তি এবং পত্নী-প্রেমের দ্বন্দ্বে আমাদের সমাজের কয়েকটি জীবন নষ্ট হতে দেখেছি। অর্থলোভ এবং নীতির দ্বন্দ্বে আজকাল পৃথিবীর সকল সমাজেরই দেশকর্মী এবং ব্যবসায়ীদের পড়তে হয়। চারিদিকের কালোবাজার প্রভৃতি দেখে মনে হয় এ বিষয়ে দ্বন্দ্বের অবস্থা তাঁরা বোধহয় অতিক্রম করে গেছেন এবং কোন্ পথে যেতে হবে তাও স্থির করে ফেলেছেন। সামাজিক নীতি বজায় রাখবার চেষ্টা এবং অন্যদিকে আপনাকে জাহির করবার আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে অনেক সময়ে যে হাস্যকর অবস্থাসমূহের (Comic situation) উদ্ভব হয় তা কে না উপভোগ করেছেন? অসামাজিক বলে যে হিংসাপ্রবৃত্তি প্রকাশ্যে চরিতার্থ করতে পারিনি

রসিকতা, ঠাট্টা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে তা সময় সময় অপ্রকাশ্যে মিটিয়ে নিই না কি ?

নিজেদের কার্যাবলী, কথাবার্তা বিশ্লেষণ করলে অনেক দ্বন্দ্বের আভাস আমরা পাই। সকলের মূলেই যে নির্জ্ঞান মনে সামাজিক নীতি এবং জন্মগত প্রবৃত্তির সংঘর্ষ বিদ্যমান আছে মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে।

জান্তব চুম্বক

লোহাকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা যেমন চুম্বকের আছে তেমনি অন্যলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর প্রত্যেক লোকেরই আছে। একজন মানুষ যে আর একজন মানুষকে বশীভূত করতে পারে এবং সংসারে অনবরত এমন করছে তা আপনাদের কারুরই অজানা নেই। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ কর্মের দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি এবং বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কাজ কর্মের ধারার উপর অন্যলোকের প্রভাব সহজেই ধরতে পারা যায়। আপনার প্রভাব অন্যলোকের উপর, বিশেষ করে আপনার ছেলেমেয়ের উপর পড়ছে, তারা আপনার মত হবার চেষ্টা করছে, আপনি অন্য লোকের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলছেন। আমরা যে সব সময় জ্ঞাতসারেই অন্যের অনুকরণ করি তা নয়। আমরা বাঙালী সাধারণত কাছা কোঁচা দিয়ে ধুতি পরি, যদিও কাউকে কাউকে আজকাল যে কোন কারণেই হোক লুঙ্গি বা পায়জামা পরে বেড়াতে রাস্তা-ঘাটে দেখা যায়, আমাদের মেয়েরা একরকমভাবে শাড়ি পরেন, আমরা ভাত তরকারি মাছ খাই, শীতকালে গায়ের কাপড় জড়িয়ে বেড়াই কারণ আমাদের সমাজে এইরকম ব্যবস্থাই চিরকাল চলে আসছে। যে প্রথা চলে আসছে

আমাদের অজ্ঞাতসারে আমরা সেই প্রথারই বশীভূত হয়ে পড়ি। তবে যদি কেউ নতুন ধরণে কাপড় পরবার কোন পন্থা বার করেন, এবং যদি তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস থাকে, তা হলে হয়ত জ্ঞাতসারেই আমি তাঁর অনুকরণ করি। কারণ, যাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করি—আমরা সহজেই তাঁর বশীভূত হই। জ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক আমরা আমাদের আদর্শের বশীভূত; আদর্শের মত হবার, আদর্শের মত ব্যবহার করবার চেষ্টা করে থাকি। যেমন ছোট ছেলে বাবার মত চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, ছোট মেয়ে মা হয়ে তার পুতুলকে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। আদর্শ কি বা কে তা হয়ত জিজ্ঞাসা করলে সকলে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারব না কিন্তু কোন একটি বা ততোধিক আদর্শ মেনে যে চলি তা অস্বীকার করতেও পারা যায় না।

কিন্তু সব সময়ে সর্বত্র সকলেই শুধু প্রচলিত প্রথা মেনেই চলছে এ কথা স্বীকার করে নিলে একটা বড় রকমের সমস্যার উদয় হয়। সকলে যদি সব সময়ে গতানুগতিকভাবে সব জিনিস মেনে নিয়ে চলতে থাকে তা হলে সমাজের পরিবর্তন হয় কি করে। সামাজিক আচার ব্যবহার, চিন্তাধারার ক্রম পরিবর্তন যে হয় এটাও কল্পনা নয়, এটা একটা বাস্তব ঘটনা। চোখের সামনে আমরা নিজেরাই ত কত পরিবর্তন দেখলুম। ছেলে মেয়েদের কর্তব্য, সমাজে তাদের পরস্পরের স্থান প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাধারার, সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের

কত ওলট পালটই হয়ে গেছে। এ সব বিষয়ে এখনকার চলতি ভাবধারাগুলো ত কিছুদিন পূর্বেকার ভাবধারার ধার দিয়েই যায় না। এ পরিবর্তন কি করে সম্ভব হল?

সম্ভব হল এই জন্যে যে, সব মানুষই সমানভাবে suggestible নয়। মানুষমাত্রেই suggestible বটে, কিন্তু সকলেই সে বিষয়ে একরকম নয়। অভিধানে suggestible কথাটির অর্থ দেখলুম, 'সম্মোহনজনক প্রেরণার অধীন। উপস্থিতক্ষেত্রে অর্থটি অতদূর অর্থাৎ সম্মোহন পর্যন্ত নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। যুক্তি বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকে কোন কিছু মেনে নেবার এবং বিশ্বাস করবার যে মনোভাব তাকেই suggestibility বলা হয়। যা মেনে নিচ্ছি, সেই অনুসারে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তার বিপরীত কোন বিষয়ে দৃঢ় অবিশ্বাস এগুলোও suggestibilityর অন্তর্ভুক্ত। এই suggestibility বিষয়ে মানুষে মানুষে কি রকম তফাৎ হয়, একটু বিবেচনা করলেই আপনারা দেখতে পাবেন। আপনার নিজের কথাই দেখুন—কোন একজন বিশেষ ব্যক্তি যদি আপনাকে কোন কথা বলেন, আপনি হয়ত তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে তা মেনে নেবেন। তাঁর সেই কথার পেছনে কতখানি যুক্তি যথার্থ আছে, বা আদৌ আছে কিনা তা যাচাই করে নেবার কোন প্রশ্নই আপনার মনে উঠবে না। আপনার বন্ধু কিন্তু সে কথা তত শীঘ্র মেনে নেবেন না। তিনি বিচার করে দেখতে চাইবেন। আপনার অসন্তোষ উৎপাদন করেও তিনি তর্কে প্রবৃত্ত হবেন। তা হলে দেখুন সেই বিশেষ

ব্যক্তিটি সম্পর্কে আপনি আপনার বন্ধুর চাইতে অনেক বেশী suggestible. যুক্তি তর্ক করবার ক্ষমতার অভাবেই যে লোক suggestible হয় তা নয়। আপনার যুক্তি তর্ক কররার ক্ষমতা কিছু কম নেই, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, সেই বিশেষ লোকটি সম্পর্কে যুক্তি তর্ক করবার প্রবৃত্তি আপনার মনে জাগে না। suggestibilityর এইটিই হচ্ছে প্রধান লক্ষণ। আমরা সকলেই অল্প বিস্তর suggestible বলেই সামাজিক প্রথা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার করবার প্রবৃত্তি আমাদের সচরাচর জাগে না, তাই যা চলে আসছে সেটা মেনে নিয়েই আমরা সাধারণত চলি। কিন্তু এইমাত্র আপনার বন্ধুর কথা যেমন বললুম, সকলেই ত সমান suggestible নন। কেউ কেউ আছেন, যাঁরা সব জিনিসই মেনে নেন না—তাঁরা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন। তাঁরাই সমাজে নতুন ধারা প্রবর্তন করতে পারেন। সামাজিক চিন্তাস্রোতকে নতুন পথে তাঁরাই চালান, কর্মপদ্ধতির তাঁরাই পরিবর্তন করেন। আপনি মনে করবেন না যে আপনি এঁদের দলের বাইরে। আপনি তাঁদেরই একজন। আপনি যেমন কোন বিশেষ লোকের কথা বিনা বিচারে বিশ্বাস করেন তেমনি আবার ভেবে দেখুন সকলের সব কথাই আপনি মানেন না—যুক্তি, তর্ক করে থাকেন। আবার এমন হয়ত কেউ আছেন যাঁর কথার প্রতিবাদ না করে আপনি থাকতে পারেন না। তিনি হয়ত গায়ের কাপড়টা মাথার উপর দিয়ে কান দুটো ঢেকে সহজ সরল ভাবেই বললেন, আজকে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে

হে, অমনি আপনি বললেন, নাঃ আজ আর এমন কি ঠাণ্ডা, কালকে এর চেয়ে ঢের বেশী ঠাণ্ডা ছিল, আজ বরং একটু গরম গরম লাগছে। বলে গলার বোতামটা খুলে দিলেন। তারপর ঐ নিয়ে খানিকক্ষণ তর্ক বিতর্ক চলতে লাগল। আসল ব্যাপারটা কোথায় চলে গেল—তর্ক করতে করতে শেষকালে দু'জনেই একমত হলেন যে, গেল বছরের আগের বছর জুন মাসের ১৫ তারিখে জব্বলপুরে যে গরম পড়েছিল গত কুড়ি বছরের ভেতর সেখানে সে রকম গরম পড়েনি। কথাটা হচ্ছে এই যে, এই সব নিবিচারে মেনে না নেবার এবং যুক্তিতর্ক করবার প্রবৃত্তি আপনারও আছে। তাই বলছি সমাজের পরিবর্তনের দায়িত্বের ভার আপনিও নিয়েছেন। আপনিও পরিবর্তনের একজন উদ্যোক্তা, দু একজন প্রথম নতুন কথা বলেন, নতুন চালে চলেন, তাঁদের যদি সমাজে প্রতিপত্তি বা prestige থাকে, অর্থাৎ সমাজের বেশী লোক যদি তাঁদের দ্বারা অধিক মাত্রায় suggestible হয়, তাহলে তারা তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে আরম্ভ করে। সমাজের ধারা বদলায়।

এই Suggestibilityর চূড়ান্ত প্রকাশ Hypnotismএ সম্মোহন ব্যাপারে। আপনারা কোন hypnotism করা ব্যাপার সামনাসামনি দেখেছেন কিনা জানি না। যিনি করেন আর যাঁকে সম্মোহিত করা হয়, এই উভয়ের মধ্যে একটি অদ্ভুত রকমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহনকারীর প্রত্যেক কথাটিই সম্পূর্ণভাবে মেনে নেন এবং তিনি যা করতে বলেন তাই করেন। Hypnotist

ভিন্ন সম্মোহিত ব্যক্তির পৃথিবীতে আর কেউ থাকে না—তাঁর কথা ছাড়া শোনবার কিছু নেই, তাঁর আদেশ ভিন্ন করবার কিছু নেই। অন্য কিছুরই জ্ঞান আর থাকে না। ব্যাপারটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে সম্মোহনকারী যত অবিশ্বাস্য কথাই বলুন আর যত অসম্ভব আদেশই করুন সম্মোহিত ব্যক্তি তাই বিশ্বাস করে এবং তাই করে। একটা পেন্সিল হাতে দিয়ে সম্মোহক সম্মোহিত ব্যক্তিকে যদি বলেন এটা একটা মাছ ধরবার ছিপ, সামনে তোমার পুকুর রয়েছে, মাছ ধর, সে ঠিক পুকুরধারে বসে মাছ ধববার অঙ্গভঙ্গীই করবে, যদিও সে বসে আছে কলকাতার কোন বাড়ীর হলঘরে। সম্মোহকের সব Suggestions, সব ইঙ্গিতই প্রায় সে গ্রহণ করে।

সম্মোহন করবার অনেক রকম প্রণালী আছে। কাউকে একদৃষ্টে কোন একটি উজ্জ্বল বস্তুর দিকে চেয়ে থাকতে আদেশ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ তোমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আস্‌ছে, চোখ বুজে আসছে এই ধরণের suggestions তাকে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে সে ঘুমিয়ে পড়ে। বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তখন আর তার থাকে না। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেও সম্মোহনকারী তাকে যা বলবেন সে তাই করবে। সম্মোহন এক রকম ঘুম বটে কিন্তু সাধারণত ঘুমের সঙ্গে তার তফাৎ আছে। প্রধান তফাৎ এই যে সম্মোহন ঘুমে সম্মোহনকারীর সঙ্গে ঘুমন্ত লোকের একটা যোগাযোগ থাকে।

সকলেই সকলকে সম্মোহন অবস্থায় আনতে পারেন না এবং কোন কোন লোককে সম্ভবতঃ একেবারেই এইভাবে বশীভূত করা যায় না। কিন্তু সম্মোহন ব্যাপারটি যে সম্ভব এবং একটি বাস্তব ঘটনা সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু নেই। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কি করে এটা সম্ভব হয়—একজন আর একজনকে কি করে সম্মোহিত করে ফেলতে পারে? যে করে তার কি কোন বিশেষ মানসিক বা শারীরিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন কিম্বা যে হয় তার কিছু বিশেষত্ব আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই জৈব চুম্বক শক্তির কথা আলোচনা করতে হয়।

Mesmer নামক একজন জার্মান চিকিৎসক অষ্টাদশ শতাব্দীতে জৈব চুম্বক শক্তির animal magnetism-এর কথা প্রথম প্রচার করেন। সম্মোহনের যে সমস্ত লক্ষণের কথা আগে বলেছি, তিনি সে সমস্তই লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস এই ছিল যে, কোন একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য তরল "পদার্থ" সম্মোহিত ব্যক্তির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তার শরীরকে বিশেষতঃ তার স্নায়ুমণ্ডলীকে অভিভূত করে। এই অদৃশ্য পদার্থের সাহায্যে দুজন লোকের মধ্যে কোন কথাবার্তা, লেখালেখি বা প্রকাশ্যে অন্য কোন রকম উপায়ে ভাবের আদান প্রদান না হলেও একজনের চিন্তা এবং অন্যান্য মানসিক ব্যাপার আর একজন জানতে পারে। এই অনুমিত সূক্ষ্ম পদার্থের Mesmer নাম দিয়েছিলেন জৈব চুম্বক। এই তথ্য স্বীকার করে নিলে অনেক ব্যাপারের (যেমন telepathy)

খুব একটা সহজ ব্যাখ্যা হয়ত পাওয়া যায়। এখনও সম্ভবতঃ অনেকেই এই অশরীরী দৈব বা পৈশাচিক চুম্বক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞান কিন্তু এ মত মেনে নেয় নি, অনেক আশ্চর্য ঘটনার কথা তখন প্রায়ই প্রচারিত হত এবং কেবল মাত্র Mesmer-এর তথ্যই যে সে সব ব্যাপারের সৎ ব্যাখ্যা দিতে পারে তা ধরে নেওয়া হত। যেমন একবার খুব রটে গেল যে, একখানা কাগজে একটা কথা লেখা ছিল। কাগজখানা একখানা খামের ভেতর পুরে সে খামখানা আবার একখানা বড় খামের ভেতর পুরে শীল করে রাখা হয়েছিল। এক ব্যক্তি তার নিজের শরীর থেকে এই অশরীরী তরল পদার্থকে খামের ভেতর পাঠিয়ে জানতে পেরেছিল কি লেখা আছে এবং ঠিক বলে দিয়েছিল। ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে ঘটনাটা সত্য বলে মেনে নিলেও আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন ব্যাপারটির মধ্যে অনেক রকম গলদ থাকার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। একজন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা করবার জন্যে প্রচার করলেন যে, তিনি একটা কাগজে একটা motto লিখে কাগজ-খানা একটা বন্ধ শীল করা বাক্সের মধ্যে পুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের কাছে রেখে দিয়েছেন। কি লেখা আছে এক বছরের ভেতর যদি কেউ তা সঠিক বলে দিতে পারেন তিনি তাকে এক হাজার ফ্রাঙ্ক (ফরাসীদেশের অর্থ) উপহার দেবেন। পনের দিনের মধ্যেই হাজার হাজার উত্তরও এসেছিল; কিন্তু তার একটিও ঠিক হয়নি। তথ্যের দিক থেকে এবং ঘটনার দিক থেকেও বৈজ্ঞানিকরা

তাই Mesmer-এর অশরীরী তরল পদার্থ মেনে নিতে পারেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি Braid এবং তাঁর পরে Liebault এক তথ্য প্রচার করলেন যা Mesmer-এর তথ্যের ঠিক বিপরীত বললেই হয়। Braid-এর মতে ক্রমাগত এক রকম ভাবে কোন ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করতে থাকলে সম্মোহন ঘুম আনা যায়। কোন ব্যক্তিকে একদৃষ্টে কোন জিনিসের দিকে চেয়ে থাকতে বললে তার ঘুম এসে যায়। এক কথা এক রকমভাবে বার বার যদি তাকে বলা হয় অর্থাৎ তাকে শোনান হয় তাতেও সে ঘুমিয়ে পড়ে। Liebault এ তথ্য মানতেন কিন্তু তিনি suggestion দেওয়াটার ওপর অর্থাৎ মানসিক দিকটার ওপরই বিশেষ জোর দিতেন। তাঁর মতে সম্মোহন প্রধানতঃ একটি মানসিক ব্যাপার—যদিও শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে অভিভূত করে তার সাহায্যে এই অবস্থা আনা যায়।

সার্কো (Charcot) এবং তাঁর শিষ্যেরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীকে অভিভূত করে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলবার ক্ষমতা চুম্বক ও অন্যান্য ধাতুর মধ্যে আছে। তারা তাদের চৌম্বক শক্তির সাহায্যে শরীরের এক অংশের রোগ অন্য অংশে নিয়ে যেতে পারে। নানা রকম শারীরিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্মোহনের নানারকম স্তর উৎপাদন করা যায়। এই মতাবলম্বীদের আর একটা ধারণা ছিল যে, শুধু হিস্টিরিয়া রোগাক্রান্তকেই সম্মোহিত করা যেতে পারে এবং সেইজন্যে

তাঁরা সম্মোহন hypnoses-কে একটি স্নায়ুর রোগ বলেই বিবেচনা করতেন।

Mesmer-এর অদৃশ্য তরল পদার্থে জৈব চুম্বকে বৈজ্ঞানিকদের আর বিশ্বাস নেই। সার্কোর তথ্যের কথাও আজকাল শোনা যায় না। Liebault প্রণোদিত "suggestion" তথ্যই সম্মোহনের একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত তথ্য বলে অনেকে মনে করেন।

স্বপ্ন

প্রাত্যহিক জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে স্বপ্ন দেখা যে তার মধ্যে একটা সেটা আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করি না অথবা উপলব্ধি করলেও তার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ কখন করি না। বরং স্বপ্ন বিষয়ে কোনও রকম গুরুগম্ভীর আলোচনা করবার প্রবৃত্তি যাঁদের মধ্যে দেখতে পাই তাঁদের আমরা নিতান্ত দুর্বলচিত্ত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলেই মনে করি। মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করে নেবার বিপক্ষে একটা মস্ত বড় যুক্তিই ত এই যে তথাকথিত মনোবিজ্ঞান জগতের বড় বড় অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে (যেমন আণবিক বোমা প্রভৃতির) দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জীবনের যত সব তুচ্ছ ঘটনার, যেমন স্বপ্ন, ভুলে যাওয়া প্রভৃতির আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে থাকে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা করাত' দিদিমা ঠাকুরমাদের কাজ, বিংশ শতাব্দীর কোনও বৈজ্ঞানিকের ঐ বিষয় নিয়ে মস্তিষ্ক চালনা করা সময় এবং শক্তির নিছক অপব্যবহার মাত্র। উপরন্তু স্বপ্ন ত একটা অত্যন্ত অসার অলীক অযৌক্তিক ব্যাপার—সাধারণভাবেই তার কোন একটা সঙ্গত আলোচনা করা যায় না। বৈজ্ঞানিক আলোচনা আবার কি করে হবে ?

যা হোক, স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সে প্রশ্ন উত্থাপন করবার উপস্থিত প্রয়োজন

নেই। বহু পুরাকাল থেকে স্বপ্ন বিষয়ে লোকে বিচার বিবেচনা করে আসছে। স্বপ্নের প্রকৃতি, কারণ, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মত প্রচার করে গেছেন। মনোবিদ্‌রা মানসিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন, স্বপ্ন একটা মানসিক ঘটনা সুতরাং তাঁদের এ আলোচনায় যোগদান করতে কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ ত নেইই বরং না করাটা হবে তাঁদের কর্তব্যের ত্রুটি। ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপার বলেই কি কোনও বিষয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অযোগ্য হতে পারে? গাছ থেকে আপেল পড়ে যাওয়াটা কি এমন প্রকাণ্ড ঘটনা? সেই ক্ষুদ্র ঘটনার উপর ভিত্তি করেই পদার্থবিজ্ঞানের একটা বৃহৎ আবিষ্কার হয়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাই তুচ্ছ হলেও কোন ঘটনাই অনুসন্ধানের অযোগ্য মনে করেন না।

উপরন্তু এক হিসাবে বলা যায় স্বপ্নই মনোবিদ্যা, শুধু মনোবিদ্যা কেন, সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেরই জন্মদাতা। আদিম যুগের জীবনের যে দুটি ঘটনা মানুষের কৌতূহল প্রবৃত্তিকে সবচেয়ে তীব্রভাবে উত্তেজিত করেছিল তার একটি হচ্ছে স্বপ্ন আর একটি মৃত্যু। এই দুটি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা থেকেই অশরীরী মন, আত্মা প্রভৃতি ধারণার প্রথম উদ্ভব হয়। অনেক যুগ ধরে নানা পথে বিপথে ঘুরে বহু তত্ত্বের (ism-এর) সৃষ্টি করে মনোবিদরা আজ আবার উপলব্ধি করেছেন যে মনের প্রকৃতি এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা করতে গেলে স্বপ্নালোচনা এড়িয়ে গেলে চলবে না। পুরাকালে স্বপ্ন যেমন মন সম্বন্ধে আলোচনার প্রথম সৃষ্টি করেছিল আজ আবার সেই

আলোচনাকে এগিয়ে দেবার সহায়তা করবে। স্বপ্ন তাই আজ মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

স্বপ্ন কাকে বলে সকলেই জানেন এবং বোঝেন। তবে স্বপ্নের দু একটি বিশেষ লক্ষণের কথা এখানে মনে করে নেওয়া ভাল। প্রথম লক্ষণ নিদ্রার সঙ্গে স্বপ্নের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, না ঘুমলে আমরা স্বপ্ন দেখি না—নিদ্রা ব্যতিরেকে স্বপ্ন হতে পারে না যদিও স্বপ্নবিহীন নিদ্রা অনেক সময়েই হয়। সুতরাং স্বপ্ন নিদ্রাবস্থারই একটা মানসিক ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে স্বপ্ন আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। সমস্ত রাত হয়ত স্বপ্ন দেখলুম কিন্তু সকালে উঠে আর কিছুই মনে রইল না। তা বলে সব স্বপ্নই যে একেবারে ভুলে যাই তা নয়। তবে ভুলে যাওয়াটাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে।

তারপর স্বপ্ন চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়—অর্থাৎ স্বপ্ন আমরা দেখি,—শুনি না বা স্পর্শ, আঘ্রাণ প্রভৃতি করি না। নির্বাকচিত্রে (Bioscope) যেমন একটা সাদা পর্দার ওপর সমস্ত ঘটনা ঘটে যায় আর আপনি তা দর্শকরূপে শুধু দেখে যান, স্বপ্ন দেখা ব্যাপারটিও ঠিক সেই রকম। একটা আপত্তি বোধ হয় আপনাদের মনে জাগছে। স্বপ্ন কি ঘুমিয়েই দেখি, কেন জেগে জেগে কখন স্বপ্ন দেখি না? তরুণ তরুণীরা, যুবক যুবতীরা জাগ্রত অবস্থাতেই ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্নই ত দেখেন। চাষীর মেয়ে—সেও ত মাঠে বসে দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখে, রাজপুত্র এসে তার প্রেমপ্রার্থী হবে, তাকে

রাজরাণী করে নিয়ে যাবে। এ রকম স্বপ্ন অল্পবিস্তর আমরা সকলেই দেখি। ভবিষ্যতের এই ধরণের কল্পনাকে জাগর-স্বপ্ন বা দিবা-স্বপ্ন (Day dreams) বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত স্বপ্নের সঙ্গে জাগর-স্বপ্নের একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। এই ধরণের কল্পনারাজ্যে যখন আপনি আপনাকে ছেড়ে দেন, তখন এ সবটাই যে নিছক কল্পনা সে বিষয় আপনি সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। কিন্তু ঘুমিয়ে স্বপ্ন যখন দেখেন তখন আপনি স্বপ্ন দেখছেন এ জ্ঞান আপনার আদৌ থাকে না।

যে স্বপ্ন আমরা দেখি সেগুলিকে এক হিসাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, কতকগুলি স্বপ্নের বিষয়বস্তু বেশ সহজ সরল স্বাভাবিক অসামঞ্জস্যবিহীন এবং অর্থপূর্ণ। ছোট ছেলেদের বেশীর ভাগ স্বপ্ন এই ধরণের। স্বপ্নে যা দেখা যায়, জাগ্রত অবস্থায় তা ঘটা আদৌ অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়, কতকগুলি স্বপ্ন অসামঞ্জস্যবিহীন এবং অর্থপূর্ণও বটে, তবে জাগ্রত জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন একজন স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর বন্ধু ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় লোকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে এবং সেখানে বন্ধুটির মৃত্যু হয়েছে। এরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয় কিন্তু বন্ধু জীবিত আছেন সুতরাং বাস্তব-জীবনের ঘটনার সঙ্গে এই স্বপ্নের খাপ খাওয়ান যায় না। তৃতীয়, কতকগুলি স্বপ্ন একেবারে অর্থহীন আজগুবি অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ, কোনও ঘটনার সঙ্গে কোনও ঘটনার যোগাযোগ নেই। জাগ্রত জীবনের

ধারার সঙ্গে ত কোনও মিলই নেই—থাকতে পারে না। বেশীর ভাগ স্বপ্ন এই ধরণেরই হয়। শেষোক্ত জাতীয় স্বপ্নে একটা অবাস্তবতার, অপরিচয়ের ভাব থাকে। স্বপ্ন-দ্রষ্টা তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে এদের খাপ খাওয়াতে কোন রকমেই পারেন না। তাই তিনি মনে করেন, সত্যিই এগুলি একেবারে বাইরের জিনিস—অন্য পৃথিবীর জিনিস, তিনি যে পৃথিবীতে বাস করেন, যে চিন্তা-জগতে বিরাজ করেন, তার সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ নেই।

কিন্তু সত্যিই কি নেই? আপনি ঐ রকম আজগুবি স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা ত একটা বাস্তব ঘটনা। তার কি কোন কারণ নেই? কারণ ভিন্ন যে কোন কার্য হয় না এটা ত বিজ্ঞান দর্শন সবেরই গোড়ার কথা। কোন একটা চিন্তা যখন আপনার মনে আসে তখন সেটা ত হঠাৎ বিনা কারণে আসে না। আপনার পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা, আপনার ইচ্ছা প্রক্ষোভ প্রভৃতির ভিতরেই তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। আপনার স্বপ্ন দেখা—তা সে স্বপ্ন যত উদ্ভট হোক—আপনার মনেরই একটা ঘটনা। সুতরাং তার কারণের সন্ধানও নিশ্চয়ই আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধারণা প্রভৃতির ভিতর থেকে পাওয়া যাবে। একথা আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডই প্রথম জোর করে বলেছেন। মানসিক রোগগ্রস্তদের চিকিৎসা করতে করতেই তিনি তাঁর নতুন স্বপ্নতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁর মতে স্বপ্ন কতকগুলি তুচ্ছ অর্থ—সামঞ্জস্য-

হীন মানসিক ব্যাপারের যথেচ্ছ সমাবেশ নয় পরন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানসিক ঘটনার বিকৃতভাবে বিকাশ। প্রত্যেক স্বপ্নই কোন একটা ইচ্ছা পূরণ করে বা করবার চেষ্টা করে। এ তত্ত্ব মেনে নেবার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আপনারা অনেক যুক্তির অবতারণা এখনই করতে পারেন। কিন্তু আপত্তি করবার আগে তত্ত্বটা আর একটু বিশদভাবে বোঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

স্বপ্নে যা দেখি তা অর্থপূর্ণই হোক বা অর্থহীনই হোক তাকে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ (Patent or manifest content) বলা যায়। এই ব্যক্ত অংশের এক একটা প্রকরণ কোনও অবদমিত চিন্তাশ্রেণীর বা প্রক্ষোভের রূপান্তর। অবাধ ভাবানুষঙ্গ প্রণালীর (Free Association Method-এর) সাহায্যে ব্যক্ত অংশটার বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তার নাম স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ (Latent Content)। ব্যক্ত অংশ যতই আজগুবি হোক, অব্যক্ত অংশ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অর্থবিশিষ্ট। প্রায়ই এই অব্যক্ত অংশ এমন কোনও একটা বাসনা বা মানসিক অবস্থা সামাজিক জীবনে যা চরিতার্থ করা বা যার বিকাশ করা সম্ভব-পর নয়। সামাজিক আদর্শ-বিরুদ্ধ বলেই কতকগুলি চিন্তা, ভাব প্রভৃতি অবদমিত হয়ে মনের নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়। মনঃসমীক্ষণ এই শিক্ষা আগেই দিয়েছে আমাদের। কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরের জিনিসের স্বভাবই হচ্ছে এই যে তারা ক্রমাগত সংজ্ঞান স্তরে (Consious Level-এ)

আসতে চায়। মনের প্রহরী (Censor) থাকে, বিবেক বলে মনে করতে পারেন, সে তাদের নিজরূপে সংজ্ঞানে আসতে দেয় না। তাই তারা ছদ্মবেশে আসে। প্রহরীকে এড়িয়ে সংজ্ঞানে আসবার নানারকম উপায়ের ভিতর স্বপ্নও একটা উপায়। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ তাই মানসিক রোগের লক্ষণের (Symptom-এর) ন্যায় অর্থহীন হয়। প্রকৃত অর্থ লুকিয়ে রাখাই তার কাজ।

অব্যক্ত অংশ কি করে ব্যক্ত অংশে পরিণত হয় তার কতকগুলি সূত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। একটা সূত্রের নাম সংক্ষেপণ (Condensation)। অব্যক্ত অংশের অনেকগুলি প্রকরণ মিশিয়ে হয়ত ব্যক্ত অংশের একটি প্রকরণ সৃষ্ট হয়। স্বপ্নে যে লোককে বেঁটে ও অন্ধ দেখলেন, তিনি হয়ত আপনার জানা একজন বেঁটে এবং আর একজন অন্ধ— এই দুইজনকে বোঝাতে পারে। আবার একটা লোকের তিনটি গুণ প্রকাশের জন্য স্বপ্নে হয়ত আপনি তিনটি লোক দেখলেন। লোক সম্বন্ধে যেমন, স্থান নাম ইচ্ছা প্রভৃতির সংমিশ্রণে তেমনি ব্যক্ত অংশে একটা অর্থহীন প্রকরণের সৃষ্টি হতে পারে। বোম্বাইতে কনফারেন্সে যাওয়া উচিত, না শরীরটা সারাতে বন্ধুর কাছে এলাহাবাদ যাওয়া প্রয়োজন—কদিন ধরে চিন্তা করবার পর স্বপ্নে হয়ত' দেখলেন যে আপনি ট্রেণে করে বেড়াতে যাচ্ছেন, একটা স্টেশনে নামলেন, যার নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে Allambay (Allahabad এবং

Bombay-র সংমিশ্রণ)। এটা অবশ্য খুব সরল একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। আসলে যা ঘটে তা এর চেয়ে ঢের বেশী জটিল। এই সংক্ষেপণ ব্যাপার শুধু যে স্বপ্নেরই বিশেষত্ব তা নয়। হাস্যরসসৃষ্টিতে (Wit), কাব্যালঙ্কারে, ভাষার ক্রমপরিণতিতে সংক্ষেপণের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সূত্রটিকে অভিক্রান্তি (Displacement) বলা হয়। অনেক সময় ব্যক্ত অংশের কোন একটা ক্ষুদ্র প্রকরণ অব্যক্ত অংশের দামী প্রকরণের প্রকাশক হয়। এর ঠিক বিপরীতও আবার হয়, ব্যক্ত অংশের খুব বড় রকমের একটা প্রকরণ হয়ত অব্যক্ত অংশের অকিঞ্চিৎকর কোন ঘটনার নির্দেশ দেয়। আর এক রকমের অভিক্রান্তি প্রক্ষোভ সম্পর্কে—ছোট একটা ঘটনার সঙ্গে গভীর প্রক্ষোভ যুক্ত হতে পারে। আবার বড় একটা ঘটনা—যেখানে প্রক্ষোভ আশা করা স্বাভাবিক—সেখানে কোন চিত্তবিকারই নেই অথবা অশোভন বিপরীত কোনও ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। স্বামীর কোনও নিকট আত্মীয়ের মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সঙ্গে অনেক লোক কনসার্ট-এ খুব হাল্কা নাচের গান বাজাতে বাজাতে এবং আনন্দের আতিশয্যে নাচতে নাচতে যাচ্ছে, তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখছেন—এক মহিলা এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। এটা বাস্তব দৃষ্টান্ত। অভিক্রান্তিও প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখবার সহায়তা করে।

তৃতীয় সূত্রটার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। এর নাম নাটন (Dramatisation)। স্বপ্নে সমস্ত ঘটনাই ছবির আকারে আসে। একজন কিছু খাচ্ছেন বা ছেলেকে প্রহার করছেন এ রকম ঘটনা ছবিতে সহজেই দেখান যায়। কিন্তু আপনি আর একজনের উপর যে ঘৃণার বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন তা কি করে ছবিতে দেখান যায়। ধরুন ঘৃণিত লোকটার দেহের উপর কোন একটা ঘৃণ্য জানোয়ারের মাথা দেখলেন। অবজ্ঞা প্রকাশ পেল না কি ? ভাল্লুক, বুলডগ প্রভৃতির ছবির ভিতর দিয়ে এক একটা জাতের মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হয়, তা ত' জানেন। খবরের কাগজে নানা রকমের ব্যঙ্গচিত্র দেখেছেন। স্বপ্নে মানসিক গুণাবলীর প্রকাশ এই ধরণের চিত্রের সাহায্যে হয়ে থাকে। গুণবাচক (adjectives), নঙর্থক (negatives) প্রভৃতি কি ভাবে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে পরিস্ফুট হয় সে বিষয়ে ফ্রয়েড এবং অন্যান্য সমীক্ষকেরা বহু গবেষণা করেছেন এবং বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

এই সব সূত্রের সাহায্যে অবদমিত কোন বাসনা সংজ্ঞানে প্রবেশ করে নিজেকে চরিতার্থ করে। এই হল স্বপ্নের মোটামুটি তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক স্বপ্নেরই অর্থ আছে। বিশ্লেষণ করলে সেই অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ করবার উপায় হচ্ছে অবাধ ভাবানুষঙ্গ প্রণালী (Free association method)। ধরুন আপনার সঙ্গে কোন এক ব্যক্তি এমন ব্যবহার করলেন যে আপনি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন—কিন্তু ঘটনাচক্র এমন ছিল

যে লোকটার বিরুদ্ধে একটা নিষ্ফল আক্রোশের ভাব পোষণ করা ছাড়া আপনার আর কিছু করবার ছিল না। আপনি স্বপ্ন দেখলেন যে, একটা ছোট ছেলে একটা বুনো ভাল্লুককে অস্ত্রাঘাত করতে করতে একেবারে কাবু করে দিলে। ছোট ছেলে যদি আপনি হন এবং বুনো ভাল্লুক যদি সেই অপমানকারী ভদ্রলোক হন, তাহলে স্বপ্নের অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। বলে রাখি, এটাও একটা কাল্পনিক সহজ দৃষ্টান্ত।

মনোজগতে প্রতীক (Symbols) একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। দেহ, জননেন্দ্রিয়, পিতা, মাতা প্রভৃতি ব্যক্ত করতে কতকগুলি এক ধরণের প্রতীক প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। স্বপ্নে সম্রাট বা সাম্রাজ্ঞী পিতামাতার প্রতীক। লাঠি গাছ প্রভৃতি পুংলিঙ্গের এবং বাক্স দরজা প্রভৃতি স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌দের মতে স্বপ্নের একমাত্র কারণ বহিরাগত কোনও উত্তেজনা। মস্তিষ্কে যে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে, নিদ্রাকালে তা শিথিল হয়ে আসে। তাই স্বপ্ন অমন এলোমেলো ধরণের হয়। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেন— স্বপ্নে দেখলেন জলপান করছেন। সুতরাং শরীরের তৃষ্ণার্ত অবস্থাটাই ঐ স্বপ্নের একমাত্র কারণ। আলোটা জ্বেলে রেখেই ঘুমুলেন; স্বপ্নে দেখলেন কোথাও যেন আগুন লেগেছে। এ স্বপ্নের কারণ ঐ বাস্তব আলোর শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া। বিস্তৃতভাবে এ তত্ত্ব আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। তবে

একথা বলা যায় যে স্বপ্নের সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে শারীরতত্ত্ব-বিদ্‌দের মত গ্রহণ করা যায় না। তর্কশাস্ত্র এবং বাস্তব ঘটনা দুইই এ তত্ত্বের বিপক্ষে। এক সময় লোকের ধারণা ছিল—এখনও অনেকের আছে—যে স্বপ্ন ভবিষ্যত ঘটনার নির্দেশ দেয় বা দূরস্থিত প্রিয়জনের সংবাদ—(দুঃসংবাদই) বহন করে আনে। আপনি স্বপ্নে দেখলেন যে মাদ্রাজে আপনার বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ; পরদিন সকালে ঠিক ঐ মর্মেই মাদ্রাজ থেকে একখানি টেলিগ্রাম পেলেন। বেশীর ভাগ স্বপ্নই ঐ ধরণের নয়। সুতরাং এ তত্ত্বও স্বীকার করে নেওয়া যায় না। শারীরতত্ত্ববিদ্‌ এবং অন্যান্য তত্ত্ববিদ্‌রা তাঁদের তত্ত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য যে সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুসারে সে সব দৃষ্টান্তেরই সঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে। সুতরাং ফ্রয়েডের তত্ত্বই যে সব চেয়ে ব্যাপক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভয়

মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার ভয়ও জন্মায়। ভয় একটি সহজাত বৃত্তি। ভয়ের উৎপত্তি এবং অভিব্যক্তির ইতিহাস জানতে হলে জান্তব জীবনের ক্রমপরিণতির ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হয়। বিবর্তনবাদীদের মতে, জন্তু জানোয়ারদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব বৃত্তি মানুষ লাভ করেছে ভয় তারই মধ্যে একটি। বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডারউইন্ বিভিন্ন শ্রেণীর পশুদের প্রক্ষোভসমূহের অভিব্যক্তি (expression of emotions) অধ্যয়ন করবার সময় তাদের ভীতিব্যঞ্জক ব্যবহার মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং মানুষের ঐ জাতীয় ব্যবহারের সঙ্গে পশুদের ব্যবহারের যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তা দেখিয়েছেন।

ভয় পেলে মানুষের চেহারার কি রকম পরিবর্তন হয়, তা অল্প বিস্তর সকলেরই জানা আছে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, চোখের তারা বিস্ফারিত হয়, শরীর কাঁপতে থাকে, বুক দুড়দুড় করে, ঘাম হয়। এ সব ছাড়া মাংসপেশী প্রভৃতির আরও অনেক সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়, যা আমরা সকলে হয়ত ঠিক ধরতে পারি না; কিন্তু বিশিষ্ট অভিনেতারা, তাঁদের এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে বলে ঠিক বুঝতে পারেন। শরীরের অভ্যন্তরেও অনেক ব্যাপার ঘটে যন্ত্রপাতির সাহায্যে যা

প্রকাশ করা যায়, যেমন রক্তের চাপ বৃদ্ধি এবং চলাচলের ব্যতিক্রম, গ্রন্থিসমূহের (glands) কার্যের বৈলক্ষণ্য, পাকস্থলীর ক্রিয়ার সাময়িক নিরোধ প্রভৃতি। মানসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে শারীরিক ব্যাপারের যোগাযোগ ঠিক কি রকম এবং কত ঘনিষ্ঠ, মনোবিদ্‌দের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে থাকেন। তাঁদের Physiological Psychologist বলা হয়। আপনি যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন, শোকে অভিভূত বা আনন্দে আত্মহারা হন, কিংবা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন কি ধরণের এবং কত রকমের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ শারীরিক পরিবর্তন হয়, তা নিরূপণ করবার চেষ্টা করা বাস্তবিকই বিশেষ আনন্দদায়ক কাজ। সৌভাগ্যের কথা, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা এবং জন্তু ও মানুষ উভয়ের উপরেই নানা দেশে বহু পরীক্ষা হয়েছে এবং অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে আমরা সমর্থ হয়েছি। এ কথা অবশ্য সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, আমরা যা জানি তার চেয়ে আমরা যা জানি না তা অনেক বেশী।

পৃথিবীতে যারা জন্মায়, নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার একটা অদম্য বৃত্তি নিয়েই তারা জন্মায়। ভয়ের মত আত্মসংরক্ষণও (self preservation) সহজাত বৃত্তি। এ দুটির মধ্যে সম্বন্ধও তাই ঘনিষ্ঠ। আমাদের পরিবেশ বেঁচে থাকবার পক্ষে সব সময় অনুকূল নয়; বরং বলা যায় যে সব সময়েই

প্রতিকূল। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করেই প্রাণী-মাত্রকেই বেঁচে থাকতে হয়। এই সংগ্রামে জয়ী হবার অনেক কায়দা (technique) জন্তু জানোয়ার এবং মানুষ আয়ত্ত করেছে, তাই তারা কেউ তিন, কেউ কুড়ি, কেউ বা তিন কুড়ি দশ বছর বাঁচতে সমর্থ হয়। কিন্তু কখনও কখনও তারা এমন প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়, যা তাদের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে। তারা বুঝতে পারে না, কি করলে এই অবস্থার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। প্রাণীর পক্ষে এই অবস্থা বিপজ্জনক অবস্থা (dangerous situation)। যে অবস্থায় আত্মসংরক্ষণবৃত্তিতে আঘাত লাগে, সেই অবস্থাই বিপজ্জনক অবস্থা। এই অবস্থায় প্রাণী যখন পড়ে, তখন তার যে প্রক্ষোভের উদয় হয়, তারই নাম ভয়। এই বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে প্রাণী অসমর্থ হলে তার মৃত্যু হয়, কিন্তু যদি কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করতে সে সমর্থ হয় তা হলে এই ভয়ই তাকে ভবিষ্যতে বাঁচিয়ে রাখবে—কি করে তা বলি। এই বিপজ্জনক পরিবেশের কোন একটা বা ততোধিক প্রকরণ (item বা element)-এর সঙ্গে ভয় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যায়, যাকে ইংরেজীতে বলে—conditioned হয়ে যাওয়া। ভবিষ্যতে প্রকরণটির ইঙ্গিতমাত্র পেলেই ভয়ের উদয় হয়, প্রাণী সে পরিবেশ থেকে দূরে চলে যায়, বিপদের মধ্যে আর পড়ে না। ভয়কে সেইজন্যে বিপদের সংকেত (danger signal) বলে বর্ণনা করা খুবই যুক্তিযুক্ত। আত্মসংরক্ষণবৃত্তি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা হলেই ভয়ের উদয় হয়।

এখানে দুটি আপত্তির কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রথম, এই যদি ভয়ের জন্মকথা হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, ভয় অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। অথচ একটু আগেই বলেছি, যে ভয় সহজাত। সহজাত এবং অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ—এ দুটি পরস্পর বিরোধী। সুতরাং একই সময়ে একই বস্তু সম্বন্ধে কি করে দুটি বাক্যই প্রয়োগ করা যায়? দ্বিতীয়, ছোট ছেলেমেয়েরা কত জিনিসে যে ভয় পায়, তার তো ঠিক নেই। অন্ধকার, জোর শব্দ, মার অদর্শন, জন্তু জানোয়ার, অচেনা লোক ইত্যাদি অনেক জিনিসই তো তার ভয়ের উদ্রেক করে। ভয় যদি অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ হয়, তা হলে চার পাঁচ বছরের জীবনের মধ্যে এত অভিজ্ঞতা তাদের কি করে সম্ভব হলো? দ্বিতীয় আপত্তিটির কথাই আগে বলি। ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক জিনিসেই যে ভয় পায়, বিশেষত বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা, সে কথা খুবই ঠিক। কিন্তু একটু মনোযোগের সঙ্গে যদি পর্যবেক্ষণ করেন, তা হলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, তাদের অনেক ভয়ই তাদের অভিজ্ঞতার উপরেই গড়ে উঠেছে, শিক্ষার ফলে বা কুফলে হয়েছে। মনোবিদ্‌রা বলেন, মাত্র কয়েকটি জিনিসের ভয় স্বভাবজাত, বাকি সবই অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। উচ্চ শব্দের ভয় স্বাভাবিক। ছোটছেলে হয়তো অন্ধকার ঘরের দিকে যাচ্ছে কিংবা কোন জানোয়ারের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছে, এমন সময় তার মা খুব চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এই—এই খোকা, যাস নি ওদিকে' অথবা 'ছি ছি, হাত দিস নি ওর গায়ে, ছুঁস নি ওকে'। এই রকম বারকতক

হলেই উচ্চ শব্দের জন্যে যে স্বাভাবিক ভয়, সেটা ওই অন্ধকারে কিংবা ওই জন্তুতে সঞ্চারিত হয়ে যায়। ছেলে অন্ধকারকে, ওই জন্তুকে ভয় করতে আরম্ভ করে। এ জবাবে প্রথম আপত্তিটি যেন আরও প্রবল হয়ে গেল। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, দু-একটি, এমন কি একটিও ভয় স্বাভাবিক, তা হলে ভয়কে অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বলা চলে না। এর উত্তরে বিবর্তনবাদের কথা মনে করতে হবে। ভয়ের উৎপত্তির কথা যখন বলছিলুম, তখন নবজাত মনুষ্যশিশুর কথা বলিনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের ক্রমপরিণতির ফলে আজ মানুষ তার মনুষ্যত্ব লাভ করেছে, সেই জন্তু-জানোয়ারদের কথাই বলছিলুম। তাদের কাছে যেটা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ ছিল, বংশপরম্পরায় চলে আসাতে মনুষ্য শিশুতে সেটা সহজাত বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার নিজের জীবনেই দেখুন না, অভ্যাস যেমন দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায় (Habit becomes second nature) জন্তু-জানোয়ারের মানুষে ক্রমপরিণত হবার ইতিহাসে তেমনই অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বস্তু সহজাত বৃত্তি হয়ে পড়ে।

জন্তু-জানোয়ারদের পরিবেশ Physical অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ। এইসব পদার্থের দ্বারা যে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারলেই তাদের আত্মসংরক্ষণবৃত্তি চরিতার্থ হয়। এ পরিবেশ মানুষেরও আছে, কিন্তু বিবর্তনের ফলে তার

আর একটা নতুন পরিবেশ গড়ে উঠেছে, যাকে আমরা বলি সামাজিক। এই সামাজিক পরিবেশ (social environment) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ওপর নির্ভর করে না—পরস্পরের ভেতর যে মানসিক সম্পর্ক সেই হচ্ছে এর ভিত্তি। মানুষ বলতে আমরা শুধু তার শরীরটাই মনে করি না, তার চিন্তাধারা, ভাব, প্রক্ষোভ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতিও বুঝি। এগুলি তার বিশেষ অন্তরঙ্গ জিনিস, অনেক সময় প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর। মানুষের কাছে তাই আত্মসংরক্ষণ মানে শুধু তার প্রাণটা বাঁচানোই নয়, এগুলিকে বজায় রাখাও আত্মসংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

পরিবেশ দু'রকম বলে মানুষের বিপদও আসে দুদিক থেকে। অন্যান্য প্রাণীদের মত পদার্থ এবং নৈসর্গিক ঘটনাবলী থেকে ত আসেই, উপরন্তু সামাজিক পরিবেশে এমন কোন ঘটনা যদি ঘটে যাতে তার মনের সম্পূর্ণতার (integrity) হানি হতে পারে বা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটায় তা হলে সে ঘটনা তার কাছে বিপজ্জনক ঘটনা বলেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ভয় বা উৎকণ্ঠার উদয় হয়। এই সামাজিক পরিবেশ একটি অতিশয় জটিল ব্যাপার এবং মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার পক্ষে সব সময় অনুকূল নয়। তাই আত্মসংরক্ষণ করতে হলে মানুষকে এখানেও দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই যেতে হয়। তবে প্রতিকূল বাহ্যিক পরিগমের আক্রমণ থেকে নিজের

প্রাণ বাঁচাবার অনেক কৌশল যেমন সে আয়ত্ত করেছে, সামাজিক পরিবেশের কতকটা নিজের বশে এনে বহু দ্বন্দ্বের হাত থেকে সে নিজেকে মুক্ত করেছে। যুগ যুগ ধরে একত্র বাস করবার ফলে সমাজের প্রত্যেকেই অন্য সকলের সাহচর্যে একটা নিরাপত্তা অনুভব করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই নিরাপত্তা-ভাবই (Sense of security) এখন সমাজের স্থায়িত্ব এবং ক্রমোন্নতির প্রধান ভিত্তি। এই নিরাপত্তা-ভাব কোন কারণে ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা হলেই আমরা নিজেদের বিপন্ন বলে বোধ করি এবং মনে আমাদের উৎকণ্ঠার উদ্রেক হয়।

এই সাধারণ তথ্য থেকে কিন্তু আপনি ঠিক কিসে ভয় পাবেন এবং কি ভাবে তা প্রকাশ করবেন, তার কোন ইঙ্গিত পাবেন না। সমাজই নিরাপত্তা-ভাব এনে দেয়, কিন্তু সব সমাজের গঠন তো একরকম নয়। আপনি যে সমাজের লোক, যার আদর্শ, ভাব, চিন্তাধারা প্রভৃতি নিজের মনের মধ্যে মেনে নিয়ে শান্তিতে বাস করেন, সেই সমাজচ্যুত হয়ে অন্য সমাজে বসবাস করতে গেলেই একটা উৎকণ্ঠার ভাব আপনার মনে আসবে। বিবাহ করবার পরই নববিবাহিতাকে নিয়ে মা, বাবা, পারবারবর্গ থেকে বিছিন্ন হয়ে বাস করা—চীনের অধিবাসীদের সামাজিক আচার নয়, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহে এটি অনুমোদিত রীতি। সুতরাং পুরানপন্থী চীনবাসী ওই কাজ করতে উৎকণ্ঠা বোধ করবেন; পাশ্চাত্য দেশ-

বাসী করবেন না। তারপর আপনার নিজের সমাজেই বিভিন্ন স্তর আছে। আপনি যে স্তরের, সেখান থেকে অন্য স্তরে যেতে হলেই আপনি অস্বস্তি অনুভব করবেন, সে অস্বস্তি উৎকণ্ঠারই রূপান্তর। আপনার পরিবারবর্গ এবং আপনার বন্ধুর পরিবারবর্গের মধ্যে অনেক বিষয়ে যথেষ্ট মিল্ থাকলেও বৈসাদৃশ্যও আছে। সেখানেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। পরিশেষে দেখুন, আপনার পরিবারের প্রত্যেক লোকেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, আপনার নিজেরও আছে। সেই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখাও আপনার আত্মসংরক্ষণের কাজ। সেখানে আঘাত লাগলেও আপনি উদ্বিগ্ন হবেন। সুতরাং সামাজিক পরিবেশের দিক থেকে এমন কোন কিছু রীতি বা ঘটনা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় না যা সব সময়ে সব দেশে সব লোকেরই মনে ভয়ের সঞ্চার করবে। পরস্পরের এতগুলি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হলে সামান্য একটু আধটু দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী তবে আমরা সাধারণত সকলের সঙ্গে মিলে-মিশেই চলি। আপনি যে বৈশিষ্ট্যের বেশি দাম দেন, সেইটি যখন বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়, তখনই আপনার উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

আরও দেখুন, বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার আত্মবোধ ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে। এখন আপনি মানে শুধু আপনার নিজের শরীর ও মন নয়। আপনার পরিবারবর্গ, বন্ধু-বান্ধব, আপনার সমাজ দেশ প্রভৃতির লোকেরাও—এঁদের

সকলকেই আপনি আপনার মধ্যে টেনে নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলেছেন, identify করেছেন, কাজেই তাঁদের বিপদ আপনি আপনার নিজের বিপদ বলেই মনে করেন। সেইজন্য তাঁদের অসুখ করলে অথবা তাঁদের শারীবিক বা মানসিক কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা হলেই আপনি ভয় পান, উৎকণ্ঠিত হন। মানুষ আবার শুধু বর্তমান নিয়েই থাকে না, ভবিষ্যতের কল্পনাও সে করে। তাই ভবিষ্যতে কোথা থেকে বিপদ আসতে পারে তার চিন্তাও সে করে, এবং সেই অনাগত ভবিষ্যৎ ভয়ের অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যবস্থা সে বর্তমানেই করে রাখবার চেষ্টা করে।

সাধারণত লোকে এই সব অবস্থায় উৎকণ্ঠিত হয়। কিন্তু আপনি আরসোলা, না মাকড়সা বুঝি, না নেংটি-ইন্দুর দেখলে অত ভয়ে আঁতকে ওঠেন কেন? এই সব নিরীহ প্রাণী আপনার কি এমন মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে? একজন ভদ্রলোক বেশ হিসাবী সাংসারিক লোক ছিলেন, কিন্তু আজকাল তিনি বাড়ি থেকে মোটেই বেরুতে পারেন না বলে কাজকর্মের অভাবে তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। তিনি বাড়ি থেকে বেরুতে পারেন না কেন জানেন? তাঁর ভয় হয়, যদি রাস্তার দুধারের বাড়িগুলো ভেঙে তাঁর ঘাড়ে পড়ে! তিনি তর্ক করেন, বলেন, এটা সম্ভব তো? আর একজন প্রৌঢ় অবসর-প্রাপ্ত গভর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, যিনি বরাবর খুব কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে

এসেছেন, বজ্রপাতের শব্দ হলেই ভয়ে প্রায় মূর্ছা যান। কেউ কেউ ভয়ের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যেন আনন্দ পান। উপস্থিত ভয়ের কোন কারণ নেই, তাই তাঁরা ভবিষ্যতে যদি এ রকম হয়, তা হলে কি হবে এই চিন্তা করেই ভীত হয়ে পড়েন এবং পাঁচজনের মনে ভয়ের উদ্রেক করবার চেষ্টা করেন। অল্প কারণে কেউ কেউ অস্বাভাবিক রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। একটু সর্দি হলেই তাঁরা নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, যক্ষ্মা প্রভৃতি কল্পনা করে নিজে তো অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হনই, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলকেও ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। অযৌক্তিক, অহেতুক, অস্বাভাবিক ভয় মাত্রকেই মানসিক রোগের, অন্তত অল্পবিস্তর মানসিক বিকৃতির লক্ষণ বলেই ধরতে হবে। কোন সাধারণ তত্ত্ব দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যেকের জীবনের ঘটনাবলী গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এই জাতীয় ভয়ের কারণ নির্ণয় করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে ভয়মুক্ত করাও যায়। একটা ভয় বোধ হয় আপনাদের কারুর কারুর আছে—কেউ স্বীকার করবেন, কেউ স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করবেন—আমি ভূতের ভয়ের কথা বলছি। আপনার আছে কি? সবচেয়ে ব্যাপক ভয় বোধ হয় মৃত্যুভয়। এ ভয়ের স্বরূপ উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে মনোবিদ্‌রা সম্প্রতি অনেক আলোচনা করেছেন।

পাগল কে ?

'পাগল' কথাটা আমরা সবাই অনবরতই ব্যবহার করে থাকি। আপাত-অসম্ভব কেউ কিছু বললেই তখনই বলি, তুমি পাগল হয়েছ, না তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, এ রকম কখনও হয়? আজই সকালে রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে শুনলুম, একজন যুবক আর একজনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, আরে, রমেশটা পাগল, তার কথায় তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন? পাগল কথাটা যে খুবই একটা চলতি সাধারণ কথা, সেটা মেনে নিতে নিশ্চয়ই আপনাদের কোন অমত হবে না। কিন্তু এখন যদি আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, পাগলামি কথাটার সত্যিই মানে কি, উন্মাদ কাকে বলে, আপনারা হয়তো একটু ইতস্তত করবেন, আমার বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে একটু সন্দিহান হবেন এবং শেষকালে আমার উদ্দেশ্যেই বলবেন, পাগল তুমিই, কারণ এত সহজ কথাটার অর্থ যখন তুমি বোঝ না, তখন তোমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। আমি পাগল এ কথা মেনে নিতে আমার একটুও আপত্তি নেই। কারণ ওই দোষ একটু আছে বলেই তো সংসারে সমাজে আপনাদের সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছি এবং চলেছি এতদিন। একেবারে পুরোপুরি স্বাভাবিক cent per cent normal লোক পৃথিবীতে আছে কি?

সেটাই তো একটা ভাববার কথা। কবি সেইজন্যেই না বলেছেন—

"পাগলকে যে পাগল ভাবে
এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নয় কে পাগল ভুবন 'পরে ?"

যাই হোক, আমার সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত মেনে নিলেও আপনারা পাগলামি শব্দটির যে অর্থ করেছেন—মাথার গোলমাল হওয়া, অর্থাৎ বুদ্ধির বা বিবেচনা শক্তির বা যুক্তি তর্কের সাহায্যে বিচার করবার ক্ষমতার অভাব হওয়া এটা একেবারে স্বীকার করা যায় না। কেন যায় না, সেটা দেখবার একটু চেষ্টা করি।

এমন হতে পারে, যেসব পাগল আপনারা দেখেছেন, তাদের বুদ্ধি বিবেচনা সাধারণত যা হওয়া উচিত, তার চেয়ে কম। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, পাগল মাত্রেরই বুদ্ধি কম, তা হলেও কিন্তু বলা যায় না যে যার বুদ্ধি বিবেচনা-শক্তি কম সে-ই পাগল। যেমন সব গাধাই চতুষ্পদ বলে চতুষ্পদ জন্তুমাত্রই গাধা—এ সিদ্ধান্ত করা যায় না। এটা হল ন্যায়শাস্ত্রের কথা। কিন্তু ঘটনার দিক্ থেকে দেখলেও আমরা দেখতে পাই যে, এমন অনেক পাগল আছে, যাদের যুক্তি-তর্ক করবার ক্ষমতা কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন আইন-ব্যবসায়ীর চেয়েও বেশী। তাদের বুদ্ধি সব সময়েই সজাগ এবং অতি প্রখর। তর্কে তাদের পরাস্ত

করা সুকঠিন ব্যাপার। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন দরিদ্র যুবক মনে করতেন যে, বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট ধনী পরিবারের কন্যা তাঁকে ভালবাসেন এবং তাঁকে তাঁদের বাড়ী গিয়ে দেখা করতে ইশারায় জানিয়েছেন। ময়লা কাপড় চোপড় পরে সে যুবকটি একদিন তাঁদের বাড়িতে প্রবেশও করেছিলেন এবং জিজ্ঞেসা করায় তাঁর আসবার কারণ যে তাঁর প্রেমপ্রার্থিনী ধনীকন্যার সঙ্গে গোপনে দেখা করা, সে কথাও বলেছিলেন। ফল কি হয়েছিল, তা অবশ্য আর বলবার দরকার নেই। কিন্তু আমি যে বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে এই যে সেই যুবকটি অঙ্কশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। শক্ত শক্ত অঙ্ক, যা বহু ছাত্রের এবং অনেক শিক্ষকেরও মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিনা আয়াসেই কষে ফেলতে পারতেন। এঁর বুদ্ধি বা যুক্তিযুক্ত বিচার করবার ক্ষমতা ছিল না এ কথা নিশ্চয়ই বলবেন না। এমন কি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইলে সহজে কেউ ধরতেই পারত না যে, সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর কোন তফাৎ আছে। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে যদি সেই ধনী ব্যক্তির বা তাঁর কন্যার কথা কেউ তুলত তখনই হোত গোলমাল। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কন্যাটি সত্যিই তাঁকে খুব ভালবাসত। তাঁকে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করা হত যে, এ ব্যাপার অসম্ভব, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে বোঝান যেত না। তর্ক তিনিও কিছু কম করতেন না, আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে, তাঁর ধারণা সত্যের উপরই

প্রতিষ্ঠিত এবং এর মধ্যে অসম্ভব কিছু ছিল না। যাই হোক, ইনি উন্মাদই বটে, তবে বুদ্ধিহীনতা এঁর উন্মত্ততার কারণ একেবারেই নয়। যুক্তি-তর্কের প্রণালীতে তাঁর দোষ ছিল না, দোষ ছিল তার ভিত্তিতে। আর সেই ভিত্তি হচ্ছে তাঁর একটা ভ্রান্ত বদ্ধমূল ধারণা। প্রশ্ন আমাদের সেইখানে। কেন, কি করে এ রকম একটা ভুল ধারণা তাঁর অন্য বিষয়ে স্বাভাবিক মনকে এ রকম ভাবে অধিকার করে বসল ?

ওই যে লোকটি একেবারে নির্বিকারভাবে চুপ করে বসে রয়েছে, কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না, শোনেও না, খেতে দিলেও খায় না, তার বাড়ী-ঘর সব পুড়ে গেছে—এ খবর দিলে কোন ভাবান্তর পাওয়া যায় না, সব সময়ে কি চিন্তা করছে ও ? চিন্তা কিছু করছে কি ? ও লোকটিও একদিন সহজ লোক ছিল। সমাজে চলাফেরা কাজকর্ম করত, কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ যেন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল, নিজের মধ্যে নিজেকে যেন গুটিয়ে নিতে লাগল। প্রথম প্রথম বাইরের ডাকে মনটা তার মাঝে মাঝে সাড়া দিত। এখন তো একেবারেই অসাড়। নিজের কল্পিত পৃথিবীতেই সে বাস করছে, বাইরের পৃথিবীর কোন অস্তিত্বই তার কাছে আর নেই। ওকেও তো উন্মাদ বলতে হবে, কিন্তু কেন কি ক'রে এ অবস্থায় ও এসে পড়ল।

আবার ওই যে ও লোকটি একদণ্ড স্থিরভাবে নেই, অনর্গল কি সব আবোল তাবোল বকে যাচ্ছে, হাসছে,

চেঁচাচ্ছে, রেগে যাচ্ছে, হাত পা ছুড়ছে, নাচছে, ও কি' ও ত উন্মাদ ? একটা কথা ওকে জিজ্ঞেস করুন, ও দশটি অসম্বদ্ধ প্রলাপ আপনাকে শুনিয়ে দেবে। আবার দুদিন বাদে ওকে দেখুন, অত্যন্ত বিমর্ষভাবে ঘরের কোণে চুপ করে বসে আছে, মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি বলছে, কি যেন অন্যায় করেছে এই ভাব। কখন কখন অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা, আবার কোন কোন সময়ে গভীর হতাশার চিহ্ন।

আরও অনেক বিভিন্ন রকমের উন্মাদ আপনারা দেখেছেন। গণনায় দেখা যায়, আমাদের দেশে উন্মাদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অবস্থার কোন প্রতিকারের বা উন্মাদদের আটক করে রেখে তাদের চিকিৎসার কোন বিশেষ চেষ্টা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বেহারে রাঁচীর মানসিক রোগের হাসপাতালের মত বাংলা দেশে ক'টা হাসপাতাল আছে ? অসঙ্গত না হলেও এ বিষয়ে এখন আর কিছু বলব না ; শুধু সমাজনেতাদের একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এ কথাটা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে।

আজ উন্মাদকে মানসিক ব্যাধি বলে বিজ্ঞান বর্ণনা করে। কিন্তু এ ধারণা বেশী দিনের নয়। কিছুদিন আগেও লোক মনে করত, পাগল যারা তাদের ওপর হয় কোন দেবতা বা অপদেবতা, বেশীর ভাগ শেষোক্তটিই, ভর করেছেন। তাই তাদের ব্যবহার এখন অলৌকিক।

আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে এই বিশ্বাস এখনও অনেকেরই আছে। ছেলে বেলায় দেখেছিলুম, এই কলকাতা শহরেই পাশের বাড়ির একটি বউয়ের হিস্টিরিয়া রোগ সারাবার জন্যে "রোজা" ডাকা হয়েছিল, এবং সে নানারকম প্রক্রিয়া করেছিল, সেকথা এখনও আমার মনে পড়ে; প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রধান ছিল ঝাঁটার দ্বারা প্রহার। ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও 'ডাকিনীদের' যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করতে হ'ত। কোন কোন বৃদ্ধার "কুদৃষ্টি" (evil eye) আছে বলে লোকে মনে করত, তাদের ডাইনী (witchess) বলত। ডাইনীরা তাদের সেই দৃষ্টির বলে অন্য লোকের, বিশেষতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখ প্রভৃতি নানারকম ক্ষতি করে—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লোকেরা সে সময়ে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। উন্মাদদের ডাইনী-জাতীয় জীব বলেই বিবেচনা করত এবং তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থাও ওই একই রকমের ছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে যখন দেখা গেল যে মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে তার বুদ্ধির বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তখন চিকিৎসকেরা মনে করলেন, উন্মত্ততা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের বিকার মাত্র। সুতরাং উন্মাদের শারীরিক নিগ্রহের পরিবর্তে তাদের মস্তিষ্কের চিকিৎসারই প্রয়োজন। এই তত্ত্ব সাধারণত আমরা সকলেই স্বীকার করে নিই, তাইজন্যে পাগলামির মানে 'মাথা খারাপ হওয়া' বলি। এই তত্ত্ব যদিও সম্পূর্ণ সত্য নয়, প্রচারের

ফলে একটা সুফল হল এই যে পাগলামি রোগটা বৈজ্ঞানিক আলোচনার বস্তু হয়ে পড়ল এবং পাগলের আচার-ব্যবহার কথা-বার্তা ধরণ-ধারণ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে চিকিৎসকেরা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। লক্ষণ হিসাবে পাগলামির নানাপ্রকার শ্রেণী বিভাগ হল এবং বিভিন্ন রকম পাগলের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে লাগল।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সময় এই তথ্যই শিখলেন এবং এই তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে যে চিকিৎসা-পন্থা, ব্যবসা আরম্ভ করবার সময় সেই পন্থাই অনুসরণ করলেন। অভিজ্ঞতার ফলে শীঘ্রই কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন এই পন্থা ভ্রমাত্মক এবং আদৌ কার্যকরী নয়। পাগলামির সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ, চিকিৎসাব্যবস্থা, এমন কি মূল তত্ত্বের ভেতর কোথাও না কোথাও গলদ আছে, যার জন্যে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগ সারে না। তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে, এ সম্বন্ধে অন্য অনেক অভিজ্ঞ মানসিক রোগ চিকিৎসকের মতও তাঁর মতেরই অনুযায়ী। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, তাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না এবং চিরাচরিত ভাবে চিকিৎসা করে যাওয়াই পছন্দ করতেন। ফ্রয়েড কিন্তু এ অবস্থা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন সত্যকে নিষ্পেষিত করে জেনে শুনে মিথ্যার গতানুগতিক পথে চলতে রাজী হল না। উন্মাদ সম্বন্ধে সত্য কি, তা জানবার জন্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জেগে উঠল,

তিনি এ বিষয়ে গভীর গবেষণা আরম্ভ করলেন! আজ পাগলদের সম্বন্ধে মানসিকব্যাধি-চিকিৎসকগণ যা কিছু নতুন জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার অধিকাংশই এই গবেষণার ফল, ফ্রয়েডের অমূল্য দান।

কি সে নতুন জ্ঞান, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। প্রথম কথা, উন্মত্ততা মানসিক রোগ বটে, কিন্তু মানুষের মন শুধু বুদ্ধির ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে না। বাসনা, কামনা, প্রক্ষোভ (emotions), চলা-ফেরা কথা কওয়ার ধরণ-ধারণ, অন্য লোকের প্রতি ব্যবহার, পছন্দ-অপছন্দ, ভালবাসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি সব তো মনেরই কাজ, এ সবের ভেতর দিয়েও তো ব্যক্তিবিশেষের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলির কোন একটির বিকার হলে তাকে মানসিক বিকার বলেই বর্ণনা করতে হবে। এক সময়ে অবশ্য ধারণা ছিল যে, এ সবগুলিই আসলে বুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, বুদ্ধিই হল মানুষের বিশেষ গুণ, যার বলে সে নিজেকে জন্তু-জানোয়ারের থেকে তফাৎ করে এবং নিজেকে চালিত করে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। বুদ্ধি যাকে বলি, তা জন্তু-জানোয়ারদেরও আছে, এবং মানুষ বুদ্ধির চেয়ে অন্য প্রবৃত্তির বশেই চলে বেশী। শেষের কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য। নিজেকে নিজে প্রতারণা করবার চেষ্টা না করে, নিজের কাজকর্ম যদি একটু বিশ্লেষণ করে দেখেন, তাহলে কথাটা যে ঠিক তা সহজেই উপলব্ধি করবেন। লোকটা সব সময়েই একটা না একটা অপকর্ম করছে, অতি বদমাস, সেইজন্যেই তো আপনি তাকে

দেখতে পারেন না। আচ্ছা, ঠিক তাই কি? না, আপনি ওকে দেখতে পারেন না (যে কারণেই হউক) সেইজন্যই ওর দোষত্রুটি আপনার এত চোখে পড়ে। কথায় বলে না— 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা!'

একটু আগে মনের যে সব প্রবৃত্তির কথা বললুম, তার অল্প স্বল্প বিকার প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। কেউ কাঁঠাল একেবারেই খেতে পারেন না, কারুর মতে কাঁঠালের মত সুস্বাদু ফল পৃথিবীতে আর নেই। আমি একজনকে জানি, তিনি মনে করেন, কেরোসিন এবং পেট্রলের মত মিষ্ট গন্ধ কোন ফরাসী প্রসাধন দ্রব্যেও নেই। এ তো হল রুচির বিকার। একজন ইতিহাস-বিখ্যাত বীরপুরুষ মাকড়সা দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠতেন! কোন একটি লোক হাড়িকাঠে জন্তু-জানোয়ারের বলি দেওয়া দেখবার সুযোগ পেলে আনন্দে আত্মহারা হতেন, আর সেইজন্যেই দিবারাত্র কসাইখানার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতেন। এ হল প্রক্ষোভের বিকার। কিন্তু যে বুদ্ধির আমরা বড়াই করি, তার বিকার কি আমাদের কাজ-কর্মের ভেতর পাওয়া যায় না? বাইরের দৃষ্টান্ত দিই। সাহেবরা মইয়ের তলা দিয়ে যায় না কেন, তেরো জন একসঙ্গে খেতে বসে না কেন? আমাদের হাঁচি, টিকটিকি, পেছু ডাকার কথা বললে আপনাদের বোধহয় ইচ্ছে হবে তাদের সমর্থনের জন্য অনেক যুক্তি-তর্ক তোলবার। রাজনীতিতে কোন একটি বিশেষ মত ও পথে আপনি দৃঢ় বিশ্বাসী, আপনাদের

কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্য পক্ষের লোকেরা, এমন কি গণ্যমান্য নেতারাও, কি করে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি এমনভাবে হারিয়ে ফেলে যে, রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর যে একমাত্র যুক্তিযুক্ত সমাধান আপনার পথেই হতে পারে, তারা সেটা বুঝতে পারে না। আপনার বিপক্ষ মতাবলম্বীদের আবার আপনার সম্বন্ধে ঐ একই ধারণা। মনোবিদ্‌রা দু' পক্ষের যুক্তি-তর্কের পেছনে একই রকমের মানসিক ক্রিয়াকলাপ দেখতে পান।

যাই হোক, পরস্পরের ভেতর এই ধরণের একটু আধটু তফাতকে মানসিক রোগ বলা যায় না। যখন একজনের কোন একটি অযৌক্তিক বিশ্বাস ক্রমশ অন্য লোকের অসুবিধা করতে আরম্ভ করে, নিজের অন্যান্য কর্তব্যের ক্ষতি করতে আরম্ভ করে, তখনই সেটা রোগের দিকে যায়। খাওয়া হয়ে গেলে একবার ভাল করে হাত মুখ ধুলে হাত মুখ পরিষ্কার হয়—এটা সাধারণ বুদ্ধিতে সকলেই বোঝে। কিন্তু যখন কেউ অন্য সবাইকার অসুবিধা করে আধ ঘণ্টা ধরে পঁচিশবার হাত মুখ ধুতে থাকে, তখন সেটা মানসিক রোগই বলতে হবে। যাঁদের বাড়িতে শুচিবাইগ্রস্তা বা গ্রস্ত কেউ থাকেন, এ ব্যাধির অত্যাচার তাঁদের ভোগ করতেই হয়। এ রোগটা সংক্রামক কি না, সেটাও চিকিৎসকদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

এই ধরণের লোককে আমরা বাই বা বায়ু-গ্রস্ত বলি, উন্মাদ বলি না। কারণ এরা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে

খানিকটা যোগাযোগ রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু যখন এই সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন সাপে কামড়াবার ভয়ে কোন লোক কলকাতার রাস্তায় চলতে পারেন না, বাড়িতেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন; যখন বায়ুগ্রস্ত লোক জলের কল থেকে নড়তে পারেন না, জলে হাত পা পচিয়ে ফেলেন, তখনই হন উন্মাদ।

উন্মাদদের মানসিক বৃত্তিগুলি সাধারণ মানুষের বৃত্তি থেকে ভিন্ন জাতীয় নয়। তাদের কোন একটা বৃত্তি হয়তো অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে কাজ করে কিংবা হয়তো অত্যন্ত ক্ষীণবল। পরিমাণের তফাৎ, গুণের তফাৎ নয়। যুক্তি-বিরুদ্ধ বিশ্বাস আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু যতক্ষণ সেগুলো পাঁচজনের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়া যায়, ততক্ষণ তারা সমাজের ক্ষতি করে না। সমাজও সেগুলো মেনে নেয়। আবার সে বিশ্বাসগুলো যদি যুক্তির ঘোরতর বিরোধী হয়, তা হলে আস্তে আস্তে তার পরিবর্তন হয়ে যায়। পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য ঘুরছে—একথা এখন কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু উন্মাদরা যে সব যুক্তিবিরোধী বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চলে, সেগুলো প্রথমত কিছুতেই বদলায় না এবং দ্বিতীয়ত সমাজ যে সব বিশ্বাস মেনে নিয়েছে তার সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না এবং তৃতীয়ত অনেক সময়ে সমাজের ক্ষতিকর। একজন উন্মাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিলো যে, পাশের গ্রামের একজন তার ঘোরতর ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে, তাইজন্যে সে শেষ পর্যন্ত

তাকে হত্যা করে বসল। বলা বাহুল্য, পাশের গ্রামের সে লোকটি তাকে আদৌ চিনত না। উন্মাদের আর একটি লক্ষণ যে, সে প্রায়ই নানারকমের অলৌকিক দৃশ্য দেখে, বাণী শোনে। সে স্পষ্ট শুনতে পায় যে, আকাশ থেকে কে একজন আদেশ করছেন—এই কর, ওই কর। আর সে তাই করে।

স্নায়বিক দুর্বলতা কয়েক রকমের উন্মত্ততার কারণ। অত্যধিক মদ্যপানে কিংবা গাঁজা চণ্ডু চরস প্রভৃতি সেবনে স্নায়ুর ব্যাধি হতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত উন্মত্ততার শারীরিক কোন ভিত্তি নেই, তাদের কারণ খুঁজতে হবে মানসিক ক্রিয়া-কলাপের ভেতর। রুদ্ধ বাসনা, অবদমিত গূঢ়ৈষা (repressed complexes) থেকেই তাদের উৎপত্তি। বিবেক এবং গূঢ়ৈষার দ্বন্দ্বই এদের মূল। লেডী ম্যাক্‌বেথ পুনঃ পুনঃ হাত ধুতেন পরিষ্কার রাখার জন্যে। কিন্তু ময়লা তো তাঁর হাতে ছিল না, ছিল মনে। তাঁর প্ররোচনাতেই ম্যাক্‌বেথ অতিথি ডান্‌কান্‌কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছিলেন। হাসপাতালে একজন রোগিণী ছিল, যে বলত রাণী এলিজাবেথের বংশে তার জন্ম এবং ইংলণ্ডের রাণী হবার অধিকার একমাত্র তারই আছে। তার অনেক সৈন্য-সামন্ত আছে এবং অনবরত সে তাদের হুকুম দিচ্ছে—ফ্রান্স আক্রমণ কর, জার্মানি আক্রমণ কর, ইউরোপের সমস্ত দেশ ছেয়ে ফেল। কিন্তু তার একজন ভয়ানক শত্রু তাকে এই সব ঐশ্বর্য, ক্ষমতা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত করতে চায়, সে-ই চক্রান্ত

করে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই। উন্মাদ হবার আগে সে দাসীর কাজ করত, বেশ কঠিন পরিশ্রম তাকে করতে হত এবং অনেক কষ্টও পেয়েছিল। প্রথম প্রথম সে জাগরস্বপ্ন দেখত যে, তার এসব কষ্টের অবসান হয়েছে এবং সে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। ক্রমে সে এই স্বপ্নে নিজেকে হারিয়ে ফেললে। বাস্তব জগৎ থেকে এই বিচ্ছেদ যখন হল তখনই হল সে উন্মাদ। প্রথমেই যে যুবকটির কথা বলেছিলুম, তাঁরও জীবনে ভালবাসা সংক্রান্ত একটা ঘটনা ঘটেছিল, যার স্মৃতি তিনি মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নি। প্রত্যেক উন্মাদের লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করলে অনেক সময়েই নানারকমের গূঢ়েষার সন্ধান পাওয়া যায়। লক্ষণগুলি হয় প্রতীকের সাহায্যে অবরুদ্ধ বাসনার অভিব্যক্তি (symbolic expression), না হয় সেই বাসনার তাড়না থেকে নিজেকে বাঁচাবার কৌশল (defence reactions)। মোটের উপর পাগলামির ভিত্তি হচ্ছে সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব। কখনও কখনও কোন লোকের রুদ্ধ ইচ্ছা সব বাধা অতিক্রম করে সোজাসুজি সংজ্ঞানে এসে উপস্থিত হয়, তখন সে লোকটি করতে পারে না এমন কাজ নেই। কারণ হিতাহিত জ্ঞান তখন তার আর থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সামাজিক জীবনেও এ রকম দুর্ঘটনা ঘটে। তখন সভ্যতার, সংস্কৃতির সব বাঁধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, মনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলো নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন আমরা

আণবিক বোমার সাহায্যে যুদ্ধ করি, নির্মমভাবে পরস্পরের গলা কাটি, মহোল্লাসে লুঠতরাজ করি, পরমানন্দে পরের ঘর-বাড়ি জ্বালাই।

দাম

"মাছটা কত হল মশাই ?"

"আরে মশাই, আর বলেন কেন, তিন টাকার কম কিছুতেই দেবে না। অনেক মারামারি করে শেষকালে দু'টাকা বারো আনায় দিলে, যা দিনকাল পড়েছে।" ভদ্রলোকটি চলে গেলেন।

ইলিশমাছ হাতে করে কোন ভদ্রলোক রাস্তায় যাচ্ছেন দেখলেই দামটা জানবার জন্যে সকলেরই মনে যেন একটা অদম্য কৌতূহল জেগে ওঠে। কতকটা সেই কৌতূহলের বশে আর কতকটা কুটুমবাড়ী শীঘ্রই ইলিশমাছ পাঠাবার জোর তাগাদা বাড়ির ভেতর থেকে হচ্ছে বলে বাজারদরের একটু আভাষ পাবার জন্যে ভদ্রলোককে দামটা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। হিসেব করে দেখলুম চারটে মাছ পাঠাতে অন্তত দশ টাকার কম কিছুতেই হবে না। কি ভয়ানক ব্যাপার। আমাদের ছেলেবেলায় দশ টাকায় কুড়িটা ইলিশ-মাছ কেনা যেত বেশ বড় বড় গোছের। পাঁচজনের কাছে শুনি পূর্ববঙ্গে নাকি সেদিনও পয়সা পয়সা ইলিশমাছ পাওয়া যেত। সেটা হয়ত গল্প—আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সে বিষয়ে কিছুই নেই, কিন্তু মাছের দাম যে সম্প্রতি অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন উপায় নেই।

আর শুধু মাছেরই বা বলি কেন প্রত্যেকটা তরিতরকারি, আটা, ময়দা, ঘি, দুধ, মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, গুড়, চিনি, তারপর কাপড়, জামা, কাগজ, পেন্সিল, জুতা ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় কোন্ জিনিসটির দাম বাড়েনি? জীবন ধারণ করা ত দস্তুর মত দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। বাজারের হিসেব লেখবার সময় রোজই কেমন একটা আক্রোশের ভাব মনে জেগে ওঠে। কার ওপর এ আক্রোশ তা পরিষ্কার বুঝতে পারি না। কল্পনায় সেটা শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চালিত করি কিন্তু কার্যত প্রায়শই তার ধাক্কা পরিবারবর্গকে, বিশেষ করে স্ত্রীকে ভোগ করতে হয়। ফলে প্রতি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সংসারে যেখানে আয় কম এবং তা বৃদ্ধি করবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই সেখানে একটা অশান্তির ছায়া সহজেই চোখে পড়ে। ছোট ছোট সংসার নিয়ে সমাজ। আমাদের সমাজ থেকে তাই সুখশান্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। দেখুন জীবনে কারুরই সত্যকার আনন্দ নেই। যন্ত্রচালিতের মত সবাই যেন নিজের নিয়মের কাজ কোন রকমে করে যাচ্ছে। প্রেরণার (initiative) একান্ত অভাব চারিদিকেই দৃশ্যমান। স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ ১৫ই আগস্ট পতাকা উত্তোলন করেই মিলিয়ে গেছে। আবার গতানুগতিকের মত চলেছি সবাই। হয়ত নেতাদের মনে নতুন অনুভূতি কিছু হয়েছে। আমরা সাধারণ লোক, আমাদের সংখ্যাই বেশী। আমাদের দুর্গতি একই রকম চলছে। যতদিন আমরা অন্তত প্রয়োজনমতও খাবার পরবার সংস্থান না

করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত আমাদের কার্যে, চিন্তায়, ভাবে কোন পরিবর্তনই আসবে না। জিনিসপত্রের দাম যতদিন না কমছে ততদিন সুখশান্তির আশা করা স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করার মতই অসমীচীন।

কিন্তু শুধু দাম বেড়েছে বলেই কি সব দুঃখ? তা নয়। দাম কমেছে বলেও সমাজের অনেক দুঃখ অনেক অধোগতি হয়েছে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে Man does not live by bread alone, মানুষ শুধু খেয়েই বেঁচে থাকে না। মানুষ বলতে আমরা শুধু তার শরীরটা বুঝি না, তার মনটাও বুঝি। শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যেমন খাওয়া প্রয়োজন, তার মনটাকে বাঁচিয়ে রাখতেও কতকগুলি উপাদানের প্রয়োজন। মানুষ সামাজিক জীব। তার মন একলা বেঁচে থাকতে পারে না। পরস্পরের মনের আদান প্রদানের ওপর তার অস্তিত্ব ও বিকাশের স্বরূপ নির্ভর করে। সেই আদান প্রদান যতই উন্নত ধরণের হবে সমাজও তত স্বাস্থ্যবান হবে। এই আদান প্রদান কি ধরণের হওয়া সঙ্গত তার একটা নির্দেশ সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস থেকে জানা যায়। কোন্ ধরণের সামাজিক কাজের দাম কি রকম তা মোটামুটি একটা ঠিকই হয়ে এসেছে—সকলে সে দাম মেনেও নেয়। সেই দামের ওলটপালট হতে থাকলে সমাজের দুর্গতি আরম্ভ হয়। দেশের জন্যে, দশজনের হিতের জন্যে স্বার্থত্যাগ এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বলিদান খুবই মহৎ কাজ। এর দাম খুবই বেশী। পরের জিনিস স্থূলভাবেই

হোক আর সূক্ষ্মভাবেই হোক কেড়ে নিয়ে নিজে ভোগ করবার দাম খুবই কম। কাজ মনেরই বিকাশ। সুতরাং কাজের দাম অর্থে, মনোবৃত্তির দামই বোঝায়। মনোবৃত্তিসমূহের দামের একটা মানদণ্ড (scale) সব সমাজেই আছে এবং এই মানদণ্ড যত বজায় রাখা যায় ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। আমাদের সমাজের এই দামের মানদণ্ডের কি অবস্থা হয়েছে একটু ভেবে দেখবার সময় হয়নি কি? যে সমস্ত মনোবৃত্তিকে, সামাজিক অভ্যাসকে দাম হিসেবে আমরা "উচ্চ" স্তরে রাখতুম সেগুলি আজ ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কথার দাম সব দেশেই সব সমাজেই লোকে এযাবৎ দিয়ে এসেছে। প্রত্যেক দেশের গল্পে ইতিহাসে এমন অনেক মহাপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা কথার দাম রাখবার জন্যে অনেক রকম নিগ্রহ ভোগ করেছেন। এমন কি কেউ কেউ প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। আমাদের দেশের দৃষ্টান্ত বিশেষ করে বলবার দরকার নেই। রামায়ণ মহাভারত যাঁরা পড়েছেন (একথা বলছি এইজন্যে যে আমার জানা অনেকেই আছেন যারা পড়েন নি) ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের কথা তাঁদের মনে পড়বে। কিন্তু আজ সেই ঐতিহ্যের নিদর্শন কোথায়? এখন কথার দামের যুগ নয় কথার ব্যবসার যুগ। এই কথা কওয়ার মারপ্যাঁচ যে যত ভালভাবে করতে পারে সে নাকি তত "উচ্চ" অঙ্গের diplomat. আমাদের সামাজিক জীবনে কথার মূল্য নেই এই—মনোভাব আধুনিক শক্তি-

রাষ্ট্রনীতির (power politics) সিনেমার ভাষায় বলতে গেলে, শ্রেষ্ঠ অবদান (যদিও "অবদান" কথাটির এইরূপ ব্যবহার সঙ্গত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে)। কথার দামের সঙ্গে সত্যের মূল্যও কমে গেছে এবং মিথ্যার খাতির বেড়ে গেছে। মিথ্যা কথা, মিথ্যা আচরণ, কপট ভদ্রতা প্রভৃতি দাম হিসেবে ক্রমেই ওপরের দিকে উঠছে। যে আজ সত্যের মর্যাদা রাখবার, অকপট ব্যবহার করবার কিছুমাত্র চেষ্টা করবে সে হয় পাগল না হয় নিতান্ত করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার পাত্র।

বাস্তব জীবনে কারও প্রতি সম্মান প্রদর্শন এখন দুর্বল মনের পরিচয়। সম্মান দেখানর সেকালের প্রথার এখন মোটে কদর অর্থাৎ দাম নেই। একসঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় দল বেঁধে ঘোরা এবং কারও উদ্দেশ্যে সম্মানসূচক কতকগুলি রব (slogan) উচ্চৈঃস্বরে আওড়ান এই এখন সম্মান দেখানর প্রকৃষ্ট পন্থা নয় কি ? সত্যি সম্মান করার চেয়ে সম্মান করি এটা পাঁচজনকে দেখানর দামই এখন বেশী।

ভারী জিনিস সব তলিয়ে গেছে, হালকা জিনিসগুলো সব ভেসে উঠেছে। যে প্রাণ শুধু এই হালকা জিনিস নিয়ে কারবার করে তারই বা আর দাম কি ? সুতরাং হত্যা করা এখন আর অপরাধ নয়। যে রাজত্বে একটি শিশুর অকাল মৃত্যু হয়েছিল বলে রামচন্দ্রও তাঁর নিজের পাপের ভয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, সেখানে আজ প্রাণ নিয়ে লোক ছিনিমিনি খেলে, বিনাশ করতে দ্বিধামাত্র করে না। সমাজ

যদি হত্যাকারীকে বীর বলে মেনে নেয়—হত্যাকারীর আর অপরাধ কি? Hero হতে কার না সাধ যায়? প্রাণের দাম যখন নেই তখন ছুর্ভিক্ষ তৈরী করে অগণিত লোক মেরে যদি আমি সুখে থাকতে পারি, কেন থাকব না? ছারপোকা আমার নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত উপস্থিত করে, তাদের বিনা দ্বিধায় মেরে ফেলি। নির্বোধ কতগুলো লোক যদি আমার ভোগ-লিপ্সার অন্তরায় হয় বিনা সঙ্কোচে তাদের পৃথিবী থেকে অপসারিত করায় পাপের কোন কথা ত ওঠেই না (বাস্তবিক ওকথাটার এযুগে ত কোন অর্থই নেই, আইন জারি করে অভিধান থেকে তুলে দেবার বোধহয় সময় এসেছে) বরং ভবিষ্যতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে থাকবার সম্ভাবনা থাকে। এ লোভ কোন্ মূর্খে ছাড়ে?

এই ধরণের দামের বিপর্যয়ের অনেক কথাই এলোমেলো-ভাবে মনে ভীড় করে আসছে। যাঁরা এই প্রবন্ধ পড়ছেন, তাঁরা একটু ভাবুন সহজেই অনেক দৃষ্টান্ত তাঁদের চোখে ভেসে উঠবে। সুতরাং প্রবন্ধ বাড়াবার দরকার কি? নিজেদের সংসারে দেখুন "লোকে কি বলবে" এর দাম কি অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। ছেলের ওষুধ কেনবার টাকা যোগাড় করতে পারছিনা কিন্তু কুটুম বাড়ীতে মাছ পাঠাতেই হবে, কারণ তা না হলে "লোকে কি বলবে"। ছোট ছেলেমেয়ের মনের উপযুক্তভাবে বিকাশের সাহায্য করার চেয়ে সংসারের আর সব খুঁটিনাটি কাজেরই দাম এখন মা বাবার কাছে বেশী। এটা কি ঠিক?

ষড়রিপুর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ এক সময়ে ছিল সমাজগঠনের ভিত্তি। তখন সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মূল্য নির্ধারিত হত নিয়ন্ত্রণের ক্রমের (degree) উপর।

ষড়রিপুর পরিপূর্ণ বিকাশই যেন আজ নতুন সমাজের লক্ষ্য ; কাজেই দামের ওই পুরাতন মানদণ্ড এখন একেবারে অচল। পুরাতন এবং নতুনের এই সংঘর্ষ আজ আমাদের চারিদিকে নানা আকারে (যেমন Individualism vs. Collectivism) ঘিরে রয়েছে তাই সর্বত্রই এই মূল্য বিপর্যয় আমাদের চোখে পড়ছে। বড় রকমের একটা যুদ্ধের পর এই রকম অবস্থার উদ্ভব হওয়া আদৌ বিচিত্র নয়। অর্জুনও যুদ্ধের এই পরিণাম কল্পনা করেছিলেন। তবে আশার কথা এই যে এ অবস্থা বেশী দিন থাকতে পারে না ; কারণ এর বিধ্বংসী বীজ এর ভেতরেই থাকে। নিরাশ হবার দুঃখ করবার কিছু নেই, কিন্তু চুপ করে বসে থাকাও কারুর পক্ষেই সঙ্গত নয়। এই অবস্থার অবসানের চেষ্টায় সকলেরই তৎপর হওয়া বিধেয়। একথা খুবই ঠিক প্রৌঢ়েরা যতক্ষণ বসে ভাববেন, যুবকরা ততক্ষণে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে। তাদের এগিয়ে যাবার লক্ষণও ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে উঠছে। বিনা কারণে জঘন্যভাবে হত্যা যেমন তারা করছে, আশ্রিতকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণদান করতেও তারা কুণ্ঠিত হয় নি। এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় কত যুবক বীরের মত, উত্তেজনার বশে নয়, আদর্শের ইঙ্গিতে নিজেকে বলি দিয়েছে তার কজনের কথা আমরা জানি? তাদের নাম

হয়ত কোনদিন ইতিহাসে উঠবে না—কিন্তু তাদের আত্ম-ত্যাগের ওপরই গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের মঙ্গলময় সমাজ। হঠাৎ একদিন ওপর থেকে স্বর্গ নেমে আসবে, অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, কালো বাজার সব মন্দা হয়ে যাবে, প্রত্যেক ঘরে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করবে,—অতি বড় আশাবাদীও (Optimist) বোধ হয় এরকম কল্পনা করেন না। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতার নীচে মানবতার ধীরে ধীরে জাগরণের যে সাড়া যুবকদের ভেতর দেখা যাচ্ছে তার ভরসাতেই জোর করে বলা যায়, আসিবে—সেদিন আসিবে। গৃহে গৃহে শান্তি আবার সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজের শৃঙ্খলা আবার ফিরে আসবে। একদিকে জিনিসপত্রের, অন্যদিকে মনোবৃত্তির দাম আবার স্বাভাবিক স্তরেই স্থির হয়ে এসে দাঁড়াবে। তখন "বনফুল" যেমন বলেছেন—বর্বরতাকে বীরত্ব, ভীরুতাকে আধ্যাত্মিকতা, আলস্যকে বৈরাগ্য বলে পথভ্রান্ত আমরা আর হব না।

৩

উন্নতি না পরিবর্তন

সমাজের স্বরূপ বর্ণনা করতে হলে তাকে প্রাণবান শরীরের (organism-এর) সঙ্গে তুলনা করা হয়, প্রাণহীন যন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রাণময় শরীরের অবয়বগুলির মত জটিল যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। যন্ত্রের কোন অংশ বিকৃত হলে সমস্ত যন্ত্রটিই বিকল হয়ে পড়ে। শরীর কিন্তু এরূপ অবস্থায় একেবারে অকর্মণ্য হয়ে যায় না। ত্রুটি সারিয়ে নেবার কিছু ক্ষমতা তার আছে, দুষ্ট অবয়বের ক্রিয়া অন্য অঙ্গের সাহায্যে চালিয়ে নিতে সে কথঞ্চিৎ সক্ষম। শরীর এবং যন্ত্রের পার্থক্যের ইহাই একটি বড় নিদর্শন, শরীরের এক একটি অংশ যেমন এক একটি কাজ করে, সমাজেও তেমনি কর্ম বিভাগ (division of labour) আছে। রাজনীতিজ্ঞ, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কৃষক, মজুর প্রভৃতি সকলেরই বিভিন্ন স্থান এবং বিশিষ্ট ক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে। ইহাদের পরস্পরের সহযোগিতার ওপরেই সমাজের সুশৃঙ্খলা নির্ভর করে।

যে কোন দেশের একশ বছর আগের সমাজের সঙ্গে আজকের সমাজের তুলনা করলে বহু পরিবর্তন সহজেই ধরা পড়বে। একশ বছর আগে কলকাতা থেকে প্রয়াগ যেতে

হলে নৌকা করে বা হেঁটে যেতে হত, হয়ত একমাস সময় লাগত। আজ চার ঘণ্টায় প্রয়াগ কেন দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছান যায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যে সমস্ত ব্যাপার আজ ঘটে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে কিছুকাল পূর্বে কেউ তার কল্পনাও করতে পারত না। মহাত্মা আজ নাই, কিন্তু তাঁর প্রার্থনা সভার বক্তৃতার কণ্ঠস্বর আজও শোনা যায়। আমেরিকায় যে বন্ধু আছেন এক্ষুনি চোখের সামনে তাঁর জীবন্ত মূর্তি দেখা যায়। জীবনযাত্রার পথ যে পূর্বাপেক্ষা বহুপ্রকারে সুগম হয়েছে, একথা আজ কেউই অস্বীকার করবেন না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পর নির্ভরশীল বলে এক শ্রেণীর কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন হওয়ায় প্রত্যেক সমাজেই সমষ্টিগত বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সমাজ মাত্রেরই রূপ বদলে গেছে।

জানিনা অন্য কারুর মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় কিনা, কিন্তু এই পরিবর্তনের কথা ভাবলে আমার মনে এক সংশয় আজকাল জাগে। এই পরিবর্তন কি উন্নতির পরিচায়ক? আদিমকালের মানুষ অপেক্ষা আমরা কি উন্নততর? প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা অপেক্ষা আমাদের কৃষ্টি কি মহত্তর?

এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে প্রথমেই অবশ্য স্থির করা প্রয়োজন উন্নতি কাকে বল্‌ব। উহার মাপকাঠি কি? কিরূপে তা নির্ণীত হবে? কোন একটা উদ্দেশ্য বা আদর্শ স্থির করে না নিলে যে উন্নতি অবনতি প্রভৃতির কোন অর্থই হয় না, একথা সহজবোধ্য। যদি এক ঘণ্টায় ৬ মাইল

দৌড়ানো আদর্শ হয়, তা হলে যে ব্যক্তি অনুশীলনের ফলে ঘণ্টায় ৫ মাইল দৌড়াতে অভ্যস্ত হয়েছে, সে নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ৩ মাইলের বেশী দৌড়াতে পারে না, তার অপেক্ষা উন্নততর এবং যে ৫ মাইল যেতে পারত সে যদি এখন ৪ মাইলের বেশী দৌড়াতে না পারে তবে তার অবনতি হয়েছে বলতেই হবে। মানসিক বৃত্তিনিচয় সম্বন্ধেও ঐকথা প্রযোজ্য। বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির একটি মাপকাঠি আমরা গড়ে তুলেছি, যার সঙ্গে তুলনা করে সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে কে কার অপেক্ষা উন্নততর বা কে সর্বাপেক্ষা উন্নততম তা নির্ণয় করি। কিন্তু মানুষের জীবন শুধু বুদ্ধিবৃত্তি বা শুধু শারীরিক বলের উপর ত নির্ভর করে না। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন বৃত্তিসমূহের ভেতর একটি সামঞ্জস্য বজায় রেখে মানুষকে চল্‌তে হয়। প্রত্যেক মানুষের ভেতর এই সামঞ্জস্যের রূপ বিভিন্ন। এই সামঞ্জস্যের রূপ বিচার করেই সমাজ এক ব্যক্তিকে উপরে বা নিম্নে স্থান দেয়। প্রশ্ন আমার এইখানে, সমাজের এই বিচারের মানদণ্ড কি? এবং তার কোন সার্থকতা আছে কি না। অতি প্রখর বুদ্ধিশালী, অশেষবিধ প্রতিভাবান কোন এক ব্যক্তি যদি, সমাজ আজ যাকে নিন্দনীয় বলে বর্ণনা করে, এরূপ কোন কার্য করেন—তবে তাঁর স্থান কোথায়? দুর্ভিক্ষের সময় একেবারে সামনেই দোকানে স্তরে স্তরে মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজান থাকা সত্ত্বেও যে লোকটি তার শিশুপুত্রকে ফুটপাতের উপর অনাহারে মরে যেতে দিল, সে সাধু না কাপুরুষ? এবং যে অন্যের অলক্ষ্যে

হাত বাড়িয়ে খাবার তুলে নিয়ে পুত্রের মুখে দিয়ে পুত্রের প্রাণ বাঁচাল, সে চোর না সাধু? দণ্ডনীয় না প্রশংসনীয়?

সুখকে (happiness) মানদণ্ডরূপে অনেকেই ব্যবহার করেছেন। সুখ মানুষের কাম্য সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রত্যেকেই যদি নিজের সুখ খুঁজতে আরম্ভ করেন তা হলে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। তাই এই সূত্র স্থাপিত হল Greatest good to greater number. অর্থাৎ যে কাজে তিনজনের সুখ হয় এবং পাঁচজনের হয় না তার চেয়ে যে কাজে পাঁচজনের সুখ হয় এবং তিনজনের হয় না তা শ্রেষ্ঠতর এবং যিনি শেষোক্ত কাজ করেন তিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্তর। এ সমাধানে মতদ্বৈধের ক্ষেত্র যথেষ্ট রয়েছে। সুখ কাকে বলে? তার উচ্চনীচ এবং পরিমাণ জ্ঞাপক স্তরভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে—যায় সমাধানে সকলের একমত হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

যা হোক, উন্নতি অবনতি বিচার করতে হলে একটি আদর্শের কল্পনা করতেই হয়। সমগ্র মানবজাতি কি কোন একটি আদর্শের দিকে চলছে? তা যদি হয় তবে সে আদর্শ কি? আমাদের সমাজ যদি ধরা যায়—তবে তার কি কোন আদর্শ আছে? যদি থাকে, তাহলে তার স্বরূপ কি? কোন্ আদর্শকে আজ আমরা সমাজের সামাজিক জীবনে অনুসরণ করছি?

প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে মনীষিগণ এবং সমাজের নেতারা আলোচনা করুন এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লেখা। কাজে

সময় সংক্ষেপ করাই যদি জীবনের আদর্শ হয় তা হলে আদিমকালের সমাজ হতে বর্তমান সমাজ যে বহু উন্নত, সে বিষয় অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। কিন্তু ইহাই কি আদর্শ ?

সমস্যাগুলি নতুন নয় জানি, কিন্তু উহাই ত আমার বক্তব্যের সহায়ক যুক্তি। এই হাজার বছর পূর্বে যে প্রশ্ন উত্থাপিত, আলোচিত হয়েছে আজ পর্যন্ত তার সমাধান হয়নি। তবে উন্নতি কোথায়? পুরাকালে মানুষ যুদ্ধে যেরূপ নৃশংসভাবে নরহত্যা করত আজও তা করে। যে পৈশাচিক উল্লাসের সহিত স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করত, আজও ঠিক সেইভাবেই স্ত্রীলোকের শ্লীলতা হানি করে। তবে উন্নতি কোথায়? আমার মূলকথা এইভাবে ব্যক্ত করে প্রবন্ধ শেষ করি—পরিবর্তন ?—নিশ্চয়ই, উন্নতি ?—সন্দেহ।

সংস্কৃতি বৈঠকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

চারশ' বছরের পাশ্চাত্য দর্শন ২!৹

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ১৷৹

ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ ১৷৹

বাংলা বর্ণলিপি ২৲

শিকারের কথা ২৷৹

নির্জ্জান মন ২৷৹

ইঙ্গিত ১৷৹

গ্র ন্থ কা র

জন্ম কলিকাতায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। মেট্রোপলিটান (মেন) ইনষ্টিট্যুশন ও স্কটিশ চার্চ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৭ খৃঃ দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এ ও ১৯১৯ খৃঃ মনোবিজ্ঞানে এম, এ পাশ করেন। কিছুদিন ভারত সরকারের অর্থবিভাগে কাজ করার পর স্যার আশুতোষের আহ্বানে ১৯২০ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে উপাধ্যায়ের পদে যোগদান করেন। লাইপজিগ্ (জার্মানী) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৬ খৃঃ পি-এইচ, ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু অবসর গ্রহণ করিলে ইনি মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ইণ্ডিয়ান সাইকো-য়্যানা-লিটিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক ও ইণ্ডিয়ান সাইকলজিক্যাল য়্যাশোশিয়েশনের বর্তমান সভা-পতি। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত মনোবিদ্যা বিষয়ে প্রবন্ধাবলী ও 'মনঃ সমীক্ষণ' গ্রন্থ দ্বারা ইনি বাঙালী পাঠক সমাজের নিকট সুপরিচিত।